

# নবীন বিজ্ঞানী

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর কর্তৃক প্রকাশিত

ত্রৈমাসিক জনপ্রিয় বিজ্ঞান পত্রিকা

প্রকাশকালঃ মার্চ, ২০১৩



- আমার পরমাণু ভাবনা
- প্রাতিস্থিক ফোটন-কণার  
জীবন ও মৃত্যু এবং তার  
পরিমাপন ও নিয়ন্ত্রণ
- বাংলাদেশের আধুনিক ধান
- সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্ব

# নবীন বিজ্ঞানী

ত্রৈমাসিক জনপ্রিয় বিজ্ঞান পত্রিকা

প্রকাশকাল : মার্চ, ২০১৩

সম্পাদক :

অধ্যাপক শামীমা চৌধুরী

প্রচ্ছদ :

শ্যামল বসাক

অঙ্গ সজ্জা :

মোঃ জিয়াউদ্দিন

প্রকাশনায় :

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

কর্তৃত্বতা স্বীকার :

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

স্বাগাযোগের ঠিকানা :

সহাপরিচালক

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর

ঢাকা-১২০৭

ফোন : ৯১১২০৮৪

ই-মেইল : infonmst@gmail.com

## সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

- |  |                                 |      |
|--|---------------------------------|------|
| ▶ আমার পরমাণু ভাবনা  | : মোঃ বফিকুল ইসলাম, পি এইচডি    | - ১  |
| ▶ প্রাতিষিক ফোটন-কণার জীবন ও মৃত্যু এবং তার পরিমাপন ও নিয়ন্ত্রণ | : অধ্যাপক এ.এম.হকুন আব্দুল করিম | - ৭  |
| ▶ সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্ব   | : প্রকৌশলী সুকল্যাণ বহুড়       | - ১২ |
| ▶ পাতি গেছো ব্যাঙ  | : শওকত ইমাম খান                 | - ১৩ |
| ▶ উইগমিল : নবায়নযোগ্য শক্তির এক সম্ভাবনাময় উৎস                 | : ফারিয়াল মাহমুদ তিশান         | - ১৫ |
| ▶ বুদ্ধি   | : ড. আকন্দ সামসুন্ন নহার        | - ১৬ |
| ▶ বাংলাদেশে অপুষ্টির কারণ ও প্রতিকার                             | : মোহাঃ আব্দুল মন্নির           | - ২১ |
| ▶ প্রকৃতির পরিচ্ছন্নতাকর্মী 'শকুন' বাচিয়ে রাখুন                 | : ড. নূরজাহান সরকার             | - ২৬ |
| ▶ বাংলাদেশের আধুনিক ধান  | : ড. মোঃ শহীদুর রশীদ ভূঁইয়া    | - ২৮ |
| ▶ শিশুর ডেঙ্গু জ্বর  | : ডঃ রবি বিশ্বাস                | - ৩৪ |
| ▶ আপেক্ষিক তত্ত্বের শতবর্ষিতা                                    | : জহুরুল হক বুলবুল              | - ৩৫ |
| ▶ জীন প্রকৌশল ও সুপারম্যান                                       | : মাহবুবা ফারহানা নাজনীন লুৎফে  | - ৪১ |

# “নবীন বিজ্ঞানী” এর নিয়মাবলী

## লেখক-লেখিকাদের জন্য

- ▶ রচনা বিজ্ঞানের যে কোন বিষয়ে হতে পারে, তবে তা যেমন নবীনদের জন্য উপযোগী হতে হবে তেমনি তার ভাষা সহজ, সরল ও আকর্ষণীয় হওয়া বাঞ্ছনীয়।
- ▶ রচনা কগজে এর পৃষ্ঠার পরিষ্কার স্পষ্টভাবে লিখে বা টাইপ করে সম্পাদক বরাবর পঠিত হবে।
- ▶ অমনোনীত লেখা ফেরৎ দেয়া হবে না।
- ▶ রচনার মৌলিকত্ব বজায় রেখে অংশবিশেষ পরিবর্তন, পরিমার্জন, পরিবর্ধন বা বর্জনের অধিকার সম্পাদকের থাকবে।
- ▶ রচনা মোটামুটি দু'হাজার শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।
- ▶ রচনার সাথে ছবি দিতে হলে সে সব ছবি লেখককেই সরবরাহ করতে হবে। হাতে আঁকা ছবি হলে পৃথক কাগজে সেটি সুন্দরভাবে চাইনিজ কালিতে ঐকে পাঠাতে হবে।
- ▶ ভুল তথ্য ও মতামতের জন্য লেখক দায়ী থাকবেন, সম্পাদক নয়।
- ▶ প্রকাশিত রচনার জন্য লেখককে সম্মানী দেয়ার ব্যবস্থা আছে।

মহাপরিচালক  
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর  
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭  
ফোন : ৯১১২০৮৪

ই-মেইল : [informst@gmail.com](mailto:informst@gmail.com)

নবীন বিজ্ঞানী পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে হলে উপরোক্ত ঠিকানায় মহাপরিচালক-এর সাথে যোগাযোগ করুন

## সম্পাদকীয়

মানব সভ্যতার শুরু থেকেই মানুষ বাঁচার তাগিদে প্রতিনিয়ত ঝড়, বৃষ্টি, খরা ইত্যাদির মত বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করে আসছে। মানুষের জীবন থেমে থাকেনি। মানুষ তার বুদ্ধির মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞানকে পুঁজি করে সমস্ত প্রতিকূলতাকে পরাভূত করে জীবন সংগ্রামে এগিয়ে যাচ্ছে। তথ্য প্রযুক্তির এ যুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নূতন নূতন আবিষ্কার ও উদ্ভাবন মানুষকে চমক লাগিয়ে যাচ্ছে। মানুষ যেন নূতন আবিষ্কারের নেশায় মেতে উঠেছে।

জ্ঞানের নূতন মানচিত্রে আমরা একটি গভীর ঐক্য লক্ষ্য করছি। আমরা জীবনের চিত্র দেখতে পাচ্ছি ডি.এন.এ-এর মধ্যে জীনের বিন্যাসে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ফলে কম্পিউটার ও আমাদের মস্তিষ্কের মধ্যে ব্যবধান কমে যাচ্ছে। মানুষের মস্তিষ্কের কাছেই সমস্ত শক্তি হার মানছে। মানুষের মেধা, প্রজ্ঞা ও সৃষ্টির পেছনে মস্তিষ্ক কাজ করছে।

‘নবীন বিজ্ঞানী’ এর এ সংখ্যায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, পি.এইচডি এর ‘আমার পরমাণু ভাবনা’ এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পদার্থবিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. এ. এম. হারুন-অর-রশীদ এর ‘প্রাতিষিক ফোটন-কণার জীবন ও মৃত্যু এবং তার পরিমাপন ও নিয়ন্ত্রণ’ লেখা প্রবন্ধ দু’টি এ সংখ্যাকে সমৃদ্ধ করেছে। এজন্য তাঁদেরকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের মুখপত্র ‘নবীন বিজ্ঞানী’ তে বিশিষ্টজনদের লেখা পাঠকদের মনে সাড়া জাগাবে বলে কামনা করছি।

শামীমা চৌধুরী  
সম্পাদক  
নবীন বিজ্ঞানী  
ও  
অধ্যাপক  
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ  
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

-“সকাল ৮.০ টা”

তিনি অবাক হলেন। আমি টেলিফোন করে তার ঘুম ভাঙিয়েছি। বললাম;

“ঠিক আছে। আপনি রেডি হয়ে নেমে যান। একবারে রওনা দিবো।”

তিনি সম্মতি জানালেন। আমি নাস্তা করার জন্য রওনা দিলাম। নাস্তা শেষে লবিতে অপেক্ষা করছি। চেয়ারম্যান আসলেন, আমরা মেট্রোর উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। মেট্রো এর টিকিট কিনতে হবে। আগের দিনও কিনেছি। বুঝলাম না, আগের মেশিন থেকে এটা আলাদা। ইংরেজী ভাষায় কোন নির্দেশনা নাই। চেষ্টা করলাম, না পেরে তথ্য বুথের মাঝ বয়সী মহিলাকে অনুরোধ করলাম। তিনি বিরক্ত হলেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও বের হয়ে দেখিয়ে দিলেন। দু’টো টিকিট কিনে রওনা দিলাম। পাতাল রেল বাংলাদেশি ঈদের ভীড়। ধাক্কাধাক্কি করে ট্রেনে এলাম। দু’টো ট্রেন পরিবর্তন করে ভোঁনুতে যেতে হয়। পরের ট্রেনে উঠে একটা স্টেশন পর ট্রেনটা আর গেল না। ফরাসি ভাষায় যাত্রীদের উদ্দেশ্যে কিছু বলা হলো। সবাই হুড়মুড় করে ট্রেন থেকে নেমে গেলেন। আমরাও নেমে পড়লাম। পরের ট্রেনে প্রায় যুদ্ধ করে উঠলাম। আবারও নির্দেশন। এলে সবাই নেমে পড়লেন। আমরাও নামলাম।

এ সময় আমাদের ওয়ার্কশপে থাকার কথা। ৯টা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি। ৯.০০ টায় ওয়ার্কশপ শুরু হবে। চেয়ারম্যান সাহেবকে বললাম,

“কোন নিশ্চয়তা নাই। চলেন হাঁটা দিই। দেরী হয়ে যাচ্ছে।”

জবাবে চেয়ারম্যান অনুরোধ করলেন:

“না স্যার। চিনি না, হারিয়ে যাবো। সবাই অপেক্ষা করছে। আমরাও করি।”

তাঁর কথার যুক্তি অর্থাৎ একমত পোষণ করে অপেক্ষা করতে লাগলাম। চেয়ারম্যান এক সুন্দরীকে জিজ্ঞাসা করলেন,

“আমাদেরকে নেমে যেতে হলো কেন? পরের ট্রেন কখন আসবে?”

ফরাসী নারী জনালেন,

“আগের ট্রেনে একজন রোগী ছিল।”

আমি তার জবাবে সন্তুষ্ট হতে পারলাম না। নারীও জানেন না পরের ট্রেনে যাওয়া যাবে কি না? তবুও ধন্যবাদ জানালাম। একটি মিষ্টি হাসি উপহার পেলাম। পরের ট্রেনে উঠলাম। এ দৃশ্য দেখলে বাংলাদেশের টিভি চ্যানেলগুলো ঈদে ঘরে ফেরার রিপোর্টিং করতেন না। নির্ধারিত স্টেশনে নেমে হাঁটতে হাঁটতে ভোঁনুতে আসলাম। গতকালের চেয়েও বেশ ঠাণ্ডা। ওয়ার্কশপ শুরু হয়ে গেছে। আয়োজকরা আড় চোখে আমাদের দিকে তাকাচ্ছেন। ওইসিডি এর প্রতিনিধি নামস্কি পরামর্শ দিচ্ছেন,

“রেগুলেটরকে অবশ্যই পরমাণু শক্তি নিরাপত্তা সংক্রান্ত সকল বিষয় জানাতে হবে।”

ইউকে এর তিনজন প্রতিনিধি, ব্যবহারকারী, নিয়ন্ত্রণকারী এবং সরবরাহকারীর দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁদের অভিজ্ঞতা জানালেন।

ডেড ওয়াইডেন, দাবী করলেন সরবরাহকারীর অভিজ্ঞতা অনেক। তাঁর অভিজ্ঞতার কিছুটা ব্যবহারকারী ও নিয়ন্ত্রণকারীকে গ্রহণ করতে হবে।

নাইজেরিয়ার প্রতিনিধি প্রশ্ন করলেন,

“সবাই বলছেন, ব্যবহারকারী ও নিয়ন্ত্রণকারীকে সব কিছু জানতে হবে। কি জানতে হবে? কিভাবে জানা যাবে? একথা তো কেউ বলছেন না।”

জবাবে আয়োজকদের প্রতিনিধি জানালেন;

“আমরা সময়ের অভাব বোধ করছি। পরে আলাপ করা যাবে।”

গতকালেও একই বক্তব্য আমরা শুনেছি। এ পর্যন্ত যা শুনেছি। যা বুঝেছি;



“বিশ্বের অন্য ঘন্টা বাধতে হবে।”

তবে সন্ধ্যায় কিশোর বাধবেন এটা কেউ বলছেন না। তবে সবাই বলছেন;

“পশ্চিম উপত্যকার নবাবগড়ের ‘জ্ঞান সমৃদ্ধ ক্রেতা’ হতে হবে।” আমার মনে হচ্ছে;

“শুনি, জেনছি না যে তিমিরে ছিলাম, সেখানেই রয়ে যাচ্ছি।” ভাবছি এ সন্ধ্যার শেষ কোথায়? কোন ফল নেই।

ফরাসি দাবী তাঁদের প্রযুক্তি সবচেয়ে ভালো। তাঁরা সব দেশকে সবচেয়ে ভালো নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।

ইটকে এবং ফরাসিরা বলছে, রাশিয়ার দাবী কতটুকু যুক্তিযুক্ত তা প্রমাণ করতে হবে।

মনে হলো এটা নোড়া পাটার ঘসাঘসি, মরিচ হিসাবে নবাবগড়ের জান যায় যায় অবস্থা।

বিক্রেতা, পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও জাতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রেক্ষাপট থেকে জ্ঞান সমৃদ্ধ ক্রেতা হওয়ার যোগ্যতা নিয়ে গ্রুপে আলোচনা হবে। চেয়ারম্যান পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের গ্রুপে, আমি জাতীয় প্রতিষ্ঠানের গ্রুপে আছি। ফিল্ডওয়ার্ডের প্রতিনিধি তাঁর দেশের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিলেন। তাঁরা অনেক এগিয়ে, পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র আছে। রিয়াক্টরের জন্য বিভিন্ন অংশও তাঁরা উৎপাদন করে। যদিও আশির দশকে পরমাণু শিল্প থেকে তাঁরা দূরে সরে গেলেও আবার নতুন করে শুরু করেছে।

আজ তিন দিন চলছে হোটেল, ওয়ার্কশপ ভোম্বু পাতাল রেলওয়ে, এর বাহিরে কোথাও যাওয়া হয় না। প্যারিসে এসে মোনালিসার বাড়ি ‘লা লুভার’ মিউজিয়াম, আইফেল টাওয়ার, নেপোলিয়ান বোনাপার্টের সমাধি, শপন এর সমাধি-সেখানে ফুল কোনদিন শুকনা হয় না; এ সব না দেখে ফিরে যাবো, ভাবতে পারছিলাম না। চেয়ারম্যান মন্তব্য করলেন,

“স্যার প্যারিস এসে কিছুই দেখবো না, এটা কি করে হয়?” স্যার অন্তত কিছু দেখে আসি। জবাবে বললাম,

“উপযোগিতা বা বিচার করে ঠিক করেন কোন সেশনটা বাদ দিবো। না হলে আগামীকাল ঘুরে আসা যাবে।”

ঠিক হলো আগামীকাল ১১.০০ টার দিকে শহরে যাবো; দেখে আবার ৪.০০ টার দিকে কর্মশালায় ফিরে আসবো।

০৬-১১-২০১২ তারিখ বিকালে হোটেল ফিরলাম। শিন নদীতে ইস্টিমার ভ্রমণ আছে। হোটেল থেকে মেট্রো করে প্যারিসের নাম করা রাস্তা ‘সানজে লিজে’ হয়ে হাঁটা দিলাম। বেশ কয়েক জনকে জিজ্ঞাসা করতে হলো।

ফরাসি পুরুষেরা তেমন কিছু জানে না। ইংরেজীতে তাঁদের আগ্রহ নেই। অন্যদিকে ফরাসী নারীরা ইংরেজীতে মোটামুটি কথা বলতে পারে। অন্যকে সাহায্য করতেও অগ্রহী। তাঁদের কয়েক জনের সাহায্য নিয়ে ৫ নম্বর জেটিতে পৌছলাম।

বেশ বড় জাহাজ, চমৎকার বসার জায়গা। ফ্রেঞ্চ শ্যামপেন নিয়ে টেবিলগুলো সাজানো। আমরা ৪ ঘন্টা শিন নদীতে কাটালাম। অনেক দিন পর নিজেকে ছাত্র মনে হলো।

সুন্দর একটা সন্ধ্যা জাহাজে কাটিয়ে ফিরে আসলাম। নদী থেকে নটরডাম ক্যাথেড্রাল, আইফেল টাওয়ার দেখলাম; ছবি তুললাম। পরে সিঙ্গাপুরের ২ জন মহিলা, লাটভিয়া এবং বেলোরসের প্রতিনিধিদের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে সানজেলিজে হয়ে রুসভেল্ট স্টেশন থেকে এক নম্বর পাতাল রেল ধরে চার্লস দ্য-গল স্টেশনে আসলাম। আমরা ট্রেন পরিবর্তন করলাম। সিঙ্গাপুরের প্রতিনিধিরা ট্রেনটার শেষ গন্তব্য ‘লা ডিফেন্স’ যাবেন। সেখানেই তারা থাকেন। আমরা থাকি অন্য এলাকায় আমাদের গন্তব্য ‘রোম’ স্টেশনে। ফরাসীরা অদ্ভুতভাবে নামটা উচ্চারণ করে। রোম হয়ে হোটেল ফিরলাম।

রাত শেষে প্রতিদিনের মত ওয়ার্কশপে যোগদানের প্রস্তুতি। এক এবং অভিন্ন নাস্তা খেয়ে একই গন্তব্যে যাত্রা।

পাতাল রেলে অসম্ভব ভিড়। চার্লস দ্য-গল এসে ট্রেন পরিবর্তন করলাম। মানুষের ভিড়ে চেয়ারম্যানকে হারিয়ে ফেললাম। আমি তাঁকে খুঁজছি। আমি জানি, তিনিও আমাকে খুঁজছেন। কিছুক্ষণ পর সিদ্ধান্ত নিলাম, একাই যাবো। ভেন্যুতে আসলাম। চেয়ারম্যান এসেছেন, ওয়ার্কশপ সবে মাত্র শুরু হয়েছে।

পর পর তিনটি উপস্থাপনা হলো। ফরাসী ইডিএফ চীনে তাদের অভিজ্ঞতা বললেন। রাশিয়ার রসআটম তুরস্কে তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা বললেন। ভিয়েতনাম তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা বললেন। ইডিএফ চীনের বিদ্যুৎ প্রয়োজনীয়তার কথা চিন্তা করে সেখানে বিনিয়োগ ও পরমাণু প্রযুক্তি নিয়ে হাজির হয়েছিল। চীনের প্রযুক্তিগত অবস্থান বিশাল বাজারে কৌশলগত পার্টনারশীপ অনেক সহজ। বাংলাদেশের জন্য এ ধরনের কৌশলগত পার্টনারশীপ তেমন কার্যকরী হবে না।

রাশিয়ান ফেডারেশন তুরস্কে একটি কোম্পানী করে তার মাধ্যমে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র করছে। দু'দেশের মধ্যে চুক্তির অধীনে কাজ হচ্ছে। তৈরি কর, মালিকানা তোমার, পরিচালনা করো যাকে কনসালটেটরা বলে বিওও। এ ধরনের মডেল বাস্তবায়নে জ্ঞান সমৃদ্ধ নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন। তুরস্কের তা আছে। আমাদের নাই, তাই এই কৌশলটিও আমাদের জন্য তেমন কার্যকর নয়।

ভিয়েতনাম জি-টু-জি মডেলে তাদের পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র বাস্তবায়ন করছে। রাশিয়া সাইট সিলেকশন, রিএক্টর তৈরি, ম্যানপাওয়ার তৈরি, ব্যবস্থাপনা, পুড়ে যাওয়া ফুয়েল ব্যবস্থাপনা করবে। তাঁরা ম্যানপাওয়ার তৈরির বিষয়ে ইতোমধ্যে বেশ কিছুটা এগিয়ে আছে। আমরা তাঁদের অনুসরণ করতে পারি।

ভিয়েতনামে রাশিয়া স্থান নির্ধারণ, রিএক্টর ডিজাইন, অপারেশন, জনবল তৈরি, ফুয়েল ব্যবস্থাপনা করে দিবে। এখানে ঝুঁকির পরিমাণ অনেক বেশী হবে মর্মে অংশগ্রহণকারীরা আশঙ্কা করছেন। রাশিয়ার সঙ্গে ভালো সম্পর্কই তাঁদের একমাত্র ভরসা। পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করতে হলে আমাদেরও এটা করা ছাড়া গতি নেই।

আলোচনা হচ্ছে, সবাই সবার মত করে মন্তব্য করছেন। আমরা কি করবো? সবাই বলছে; তোমাদের সিদ্ধান্ত তোমাদের গ্রহণ করতে হবে। এ জন্য তাঁদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে পারি। আমাদের শুধু অভিজ্ঞতা হলেই চলবে না, অর্থও প্রয়োজন। মি. রেলোট অর্থপ্রাপ্তি এবং অনিশ্চয়তা ব্যবস্থাপনা নিয়ে কথা বললেন। পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প অন্য প্রকল্পে বিনিয়োগ থেকে আলাদা।

তিনি দাবী করলেন শুধু মাত্র বিদ্যুৎ তৈরি করার জন্য এ ধরনের বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়া ঠিক নয়। বিনিয়োগকারী তার বিনিয়োগে লাভ খুঁজবে। অনেক দেশ জানে বিনিয়োগকারী পাওয়া যাবে না। সেখানে সরকারকেই বিনিয়োগ করতে হবে। না হলে জনগণকে বিদ্যুৎ দেয়া যাবে না।

নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য একটি আইনগত ভিত্তি দরকার। আইনগত ভিত্তি নির্ভর করে;

- (১) সরকারের ভূমিকা কি?
- (২) কোথা থেকে বিনিয়োগ আসবে?
- (৩) কোন ধরনের আইনগত কাঠামোর মধ্যে কাজ করতে হবে?

নিউক্লিয়ার আইন কাঠামো তৈরির সময় সকল ধরনের আইনী কাঠামো মাথায় না রাখলে পরে জটিলতা দেখা দিবে মর্মে বক্তারা সতর্ক করলেন।

০৮.১১.২০১২ তারিখ থেকে টেকনিক্যাল সেশান শুরু। ফ্রান্সে যেতে হবে। সকালে সেই পরিচিত নাস্তা শেষে লাটভিয়ার প্রতিনিধিদের সাথে 'লাজারে' ট্রেন স্টেশনের জন্য রওয়ানা দিলাম। ট্রেনে গ্রুপে 'ভালোগনেস' পৌঁছলাম। পরে বাসে ফ্রান্সে। ট্রেনে বাক্স খাবার ফ্রিজ থেকে বের করে দেয়া হলো। পনির, টমাটো, রুটি দেয়া হয়েছে। ট্রেনে আসছি টের পেলাম না। কোন ঝাঁকুনি, শব্দ নাই। কোন হকার বা ভিক্ষুকের দেখা মিলল

ন মনটি বদলায় হয়ে গেল, এরা পেরেছে আমরা আজও পারলাম না।

মেশিন শুরু হয়েছে। উপস্থাপিকা আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং স্থানীয় শেয়ার হোল্ডারদের কিভাবে আরও সশক্ত করা যায় সে সম্বন্ধে বলছেন। পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য এগুলো নতুন কিছু নয়। এদেরকে চিন্তা-এ. এন্ডের সাথে আলোচনা করা; তাঁদের বলো; আরও নানান কিছু। সব প্রকল্পের জন্যই এগুলো করতে হয়। এরা করে আমরাও কখনো সখনো করি। সব সময় করলে ভালো হয়।

পরের বক্তা বললেন এই প্রকল্প কি করা হয়েছে। কিভাবে সুপারভিশন এবং কমিশনিং করতে হয়েছে ইত্যাদি। একজন কর্মকর্তা আমাদের দু'ভাগে বিভক্ত করে কন্ট্রোল রুম সিমুলেটর দেখালেন।

হোটেল বার্নার্ডিল ডিক্যাপ রাত ৮.০০ টায়, হোটেল ডে প্যারিসে ইডিএফ এর ডিনার আছে। আগামীকাল ফর্মারভিল পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র দেখবো।

পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ঢোকার আগে পাসপোর্ট পরীক্ষা করা হলো। আমাদের দু'ভাগে বিভক্ত করা হলো। সকালে গেলাম চলমান পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে, বিকালে নির্মাণাধীন কেন্দ্রে। অন্য একটি লেখায় অ'পনাদের 'পরমাণু চুল্লিতে কিছুক্ষণের' অভিজ্ঞতা জানাবো।

দুপুরের খাওয়া শেষ করেছি। টেকনিক্যাল ওয়ার্কশপ শেষ হলো। কফি খেয়ে বাসে 'ভালগনে'। সেখান থেকে প্যারিসে রাত ৯.৩০ মিনিটে আগের হোটেলে ফিরলাম।

সকালে সেই নাস্তা শেষ ১১.০০ টায় চেক আউট করে ট্যাক্সি নিয়ে চার্লস দ্য-গল বিমানবন্দরে; ইমিগ্রেশন শেষে আমিরাতের বিমান ধরে দুবাই হয়ে বাংলাদেশ পৌছলাম। ঢাকা সময় সকাল ৮.৩০ মিনিট; বাসায় গিয়ে গোসল-নাস্তা শেষে অফিসে আসতে হলো। আমি এখন অফিসে।

মোঃ রফিকুল ইসলাম, পি.এইচডি  
সচিব  
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়  
বাংলাদেশ সচিবালয়  
ঢাকা



# প্রাতিশ্বিক ফোটন-কণার জীবন ও মৃত্যু এবং তার পরিমাপন ও নিয়ন্ত্রণ

## প্রথম তরঙ্গ পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার

### (১.১) ২০১২-সালের পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার

২০১২ সালে পদার্থবিজ্ঞানে যে দু'জন পদার্থবিজ্ঞানী এই শাখায় নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন তাঁদের একজন ফরাসী-অধ্যাপক সার্জ হারোস (Serge Haroche) এবং অন্যজন আমেরিকান-অধ্যাপক ডেভিড ওয়াইনল্যান্ড (David Weinland)। এ দু'জন নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করে কোয়ান্টাম জগতের বাসিন্দা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণাসমূহকে আমাদের জন্য উঁকি দিয়ে “দেখার” ব্যবস্থা করে দিয়েছেন যার ফলে এখন আমাদের দৃষ্টিগোচরের সীমানায় এসে গিয়েছে রহস্যবৃত্ত এই আশ্চর্য জগতের কণাসমূহ যেমন ফোটন বা আলোক-কণা এবং অন্যান্য আয়ন বা আধানহীন পরমাণু। এর ফলে ১৯৯০ সাল থেকেই কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞানে নতুন নতুন মৌলিক পরীক্ষার দ্বার খুলে দিয়েছে যার ফলে একক বা প্রাতিশ্বিক আয়ন এবং ফোটন এখন আমাদের “দেখার” সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে যাকে বলা যায় নতুন মিলেনিয়ামে বিজ্ঞানের জয়যাত্রার নতুন মাইলফলক। এই “দেখার” মূল বৈশিষ্ট্য এই যে এখন প্রাতিশ্বিক (Individual) কণাকে “দেখা” যাবে তাদের কোয়ান্টাম বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে অর্থাৎ তাদের কোয়ান্টাম বৈশিষ্ট্যের বিন্দুমাত্র হানি না ঘটিয়েই।

এক শতাব্দীর প্রাচীন কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞান ভৌত-প্রকৃতির অনেক কিছুরই বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দিতে পারে, কিন্তু একই সঙ্গে তা অন্তর্ভুক্ত করে প্রাতিশ্বিক বিচ্ছিন্ন কণার ভৌত আচরণের বিচিত্র এর বর্ণনা যা অনেকের পক্ষে সাধারণক্রম বহির্ভূতই বলে মনে হয়। কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞানে কোয়ান্টাম কণা আমাদের সুপরিচিত “হয় এটা, না-হয় ওটা” এই ধারণা মানে না বলেই মনে হয়, কেননা এই তত্ত্বের কণাগুলি একই সঙ্গে দুটো বিপরীত-গুণ সম্পন্ন বৈশিষ্ট্যই দেখায় তত্ত্বের দাবী অনুসারেই। এর কারণ অবশ্য কোয়ান্টাম তত্ত্বের মূল ভিত্তিপ্রস্তর হল সমাহার বা সমাবেশ (Superposition) নীতি যা দাবী করে যে যে-কোন কোয়ান্টাম অবস্থা অবসিত অবস্থার যোগফল এবং এটাই চিরায়ত পদার্থবিজ্ঞান ও কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞানের মধ্যে মূল পার্থক্য।

স্বতন্ত্রভাবে হারোস এবং ওয়াইনল্যান্ড যাদের উভয়ের বয়স ৬৮ “তারা বিভিন্ন উদ্ভাবনী কৌশলসম্পন্ন পরীক্ষণ-পদ্ধতির বিকাশ সাধন করে ক্ষণভঙ্গুর কোয়ান্টাম অবস্থাকে মাপা এবং নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করেছিলেন যার জন্য সুইডিশ রয়েল অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস তাঁদের যথার্থই নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করেছেন। ওয়াইনল্যান্ড ফাঁদে বা ট্রাপে (Trap) আবদ্ধ করেছিলেন আয়নকে (বিদ্যুৎ অধিকযুক্ত বা আহিত পরমাণুকে) এবং তাদের ওপর মাপন প্রক্রিয়া প্রয়োগ করেছিলেন আলোকের সমীপে। অন্যদিকে হারোস নিয়ন্ত্রণ এবং মাপনে প্রক্রিয়া আরোপ করেছিলেন ফোটনের ওপর যা আবদ্ধ করা হয়েছিল একটি মাইক্রোস্কোপের ফোটন বাস্তবে যার বিকল্প দুটি ধাতব দর্পণ যারা পরস্পরের ২.৭ সেন্টিমিটার দূরে অবস্থিত।

রয়েল সুইডিশ অ্যাকাডেমি বলেছেন যে, এইসব পথপ্রদর্শক পদ্ধতি সম্ভব করেছে এই গবেষণাক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপটি নিতে যার মাধ্যমে কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞান ভিত্তিক অতিক্রান্ত গতির কম্পিউটার তৈরি করা সম্ভব হয় একদিন। এই গবেষণা সম্ভব করেছে অত্যন্ত নির্ভুল ঘড়ি প্রস্তুত করার কাজ যা হবে সময়-মাপ-কাঠি নির্ণয়ের ভবিষ্যতের ভিত্তি।

নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির সংবাদ যখন হারোস পেয়েছিলেন তখন তিনি সস্ত্রীক “রাষ্ট্রায় প্রকটি বৈধির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম যে জন্য আমি সেখানেই বসে পড়তে পেরেছিলাম। এটা ছিল অভিভূত করার মতোই সংবাদ”। তিনি আরো বলেছেন যে, “কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞানে তাঁর কাজের চূড়ান্ত ফল হবে অচিন্ত্যীয় দ্রুতগতির

কম্পিউটার তৈরি করা। আপনি ভবিষ্যতে এমন সব কাজ করতে পারবেন যা চিরায়ত পদার্থবিজ্ঞানের আইন অনুসারে করা অসম্ভব। এই কোয়ান্টাম গবেষণা জিপিএস (GPS) দিকনির্দেশক ব্যবস্থাকে আরো নিখুঁত করতে সহায়তা করে সাহায্য করবে।

অন্যদিকে ওয়াইনল্যান্ড যখন সংবাদটি পেলেন তখন তিনি নিদ্রিত কেননা ডেনভারের সময় তখন রাত সাড়ে তিনটে। তিনি বলেছেন যে, “তিনি পেয়েছিলেন এক প্রচণ্ড ধাক্কা।” যদিও এ প্রসঙ্গে তাঁর নামে পূর্বেই উঠে এসেছিল কিন্তু এবছর আর কিছুই শোনা যায়নি। “এটা অবশ্যই আশ্চর্যজনক এক ব্যাপার এবং কিছুটা অভিভূত করার মতোই। মনে হয় রাতারাতি আমি বেশ বুদ্ধিমান হয়ে গিয়েছি।” তিনি সততার সঙ্গে স্বীকার করেছেন যে এই বিশেষ ক্ষেত্রে অনেকেই কাজ করছিলেন। অনেকেই প্রাথমিক কম্পিউটার এবং পারমাণবিক ঘড়ির ওপর বহুদিন ধরে কাজ করছিলেন। তাই শুধু দুজনকে বিবেচনার মধ্যে আনাটা কিছুটা বিব্রতকরও বটে।

এইসব পদার্থবিজ্ঞানী আজকাল সকলেই মনে করেন যে আগামী কয়েক দশকেই আমাদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কোয়ান্টাম কম্পিউটার তৈরির জগতে প্রবেশ করতে সক্ষম হবে। নোবেল কমিটির বিজ্ঞ বিচারকদের ভাষায় কোয়ান্টাম কম্পিউটার মানুষের জীবনে এমন সব বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবে যা বিগত শতাব্দীতে বর্তমানের কম্পিউটার আনতে সক্ষম হয়েছিল। মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিস্টোফার মনরো ১৯৯৩ সালে ওয়াইনল্যান্ডের সঙ্গে কাজ করেছিলেন এবং সেসময়েই তাঁরা একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ পরমাণুকে দুটি ভিন্ন স্থানে একই সময়ে স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ওই সময়ে এটা পরিষ্কার ছিল না যে একক পরমাণুকে ফাঁদে আটকানোর ফলে অতি দ্রুত কোয়ান্টাম কম্পিউটার তৈরি করার দ্বার খুলে যাবে। এই সমগ্র বিষয়টির “হঠাৎ আমাদের কোলে” (Suddenly in our lap) এসে পড়েছিল।

সাধারণ কম্পিউটারে তথ্য পরীক্ষায়ন (Representation) করা হয় বিট (Bit) দিয়ে যা হয় শূন্য (0) না হয় এক (1)। কিন্তু কোয়ান্টাম কম্পিউটারে একটি প্রাতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ কণা প্রাতিদ্বন্দ্বিতায়িত হয় শূন্য অথবা এক উভয় সংখ্যা দিয়ে একই সময়। অর্থাৎ এখানে কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানের সমাহার তত্ত্ব সরাসরি ব্যবহার করা সম্ভব হবে। এর ফলে যে কোন বর্ণনা ক্রমে বিদ্যুৎ গতিতে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে বলে সকলেই আশা করছেন।

## দ্বিতীয় তরঙ্গ ফোটনকে নতুন দৃষ্টিতে “দেখা”

### (২.১) কোয়ান্টাম অবিনাশী মাপন প্রক্রিয়া

বিশ্ব যেসব সাংগঠনিক উপাদান দিয়ে তৈরি মোটা দাগে তাদের নাম পরমাণু এবং ফোটন এবং এদের আচরণ ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে যে বিজ্ঞান তার নাম কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান যা আবিষ্কৃত হয়েছিল প্রায় এক শ বছর পূর্বে ১৯২০ থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে। এসব কোয়ান্টাম কণা কদাচিত্ আমাদের কাছে বিচ্ছিন্নভাবে তাদের প্রাতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ (Individual) রূপে দেখা দেয়। কেননা এরা তাদের পরিবেশের সঙ্গে সবসময়ই প্রবলভাবে বিক্রিয়াশীল। কিন্তু এইসব কণার সমগ্রদলের (Ensemble-এর) আচরণ সাধারণত (Isolated) বিচ্ছিন্ন কণার আচরণ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং তাই চিরায়ত পদার্থবিজ্ঞান বিচ্ছিন্ন কণাগুলোর সামগ্রিক আচরণ সার্থকভাবেই বর্ণনা করতে পারে। অবশ্য কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানের শুরু থেকেই পদার্থ বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন মানস-পরীক্ষার (Thought experiment) প্রস্তুত করেছেন যার মাধ্যমে এইসব প্রাতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ কোয়ান্টাম কণার বৈশিষ্ট্য ও আচরণের ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়।

১৯৮০-১৯৯০ সালের দিকে পদার্থবিজ্ঞানীরা তৈরি করেছেন বিশেষ এক ধরনের ফাঁদ বা ট্রাপ (Trap) যার মধ্যে একটি প্রাতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ আয়নকে (আধানহীন পরমাণু) আবদ্ধ করা যায় এবং লেজার রশ্মির সাহায্যে সমগ্র ব্যবস্থাটিকে পরম শূন্যডিগ্রির তাপমাত্রার কাছে শীতল করে কণা বা আয়নটিকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এভাবে

প্রাতিষিক আয়নকে অত্যন্ত নির্ভুলভাবে নিয়ন্ত্রণ করে সম্পূর্ণ স্থির অবস্থায় (In situ) নিয়ে এসে তাকে “দেখা”ও যায় ফোটন ব্যবহার করে এমন এক পরিবেশে যেখানে তার সঙ্গে অন্য কোন কণার বিক্রিয়া সর্বনিম্ন।

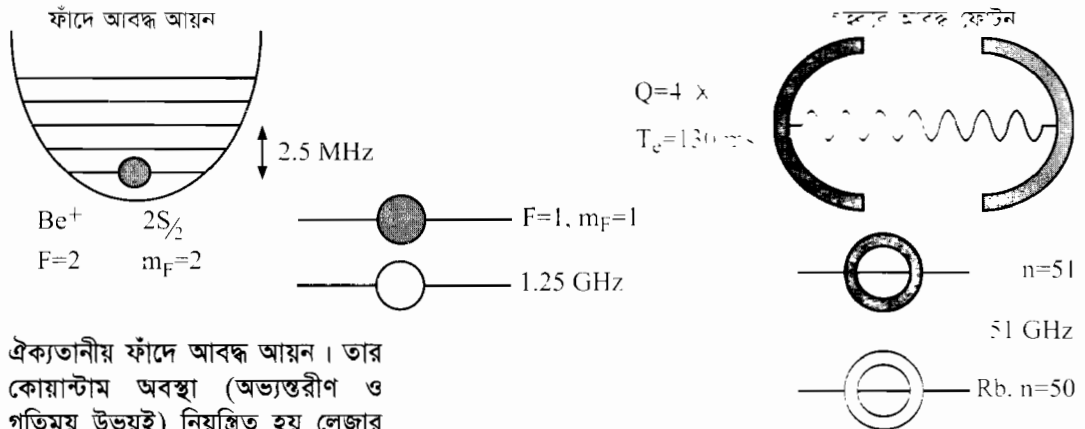
এ ধরনের বৈপ্লবিক পদ্ধতি ব্যবহার করে এখন সম্ভব হয়েছে ক্ষুদ্রাণুজীবের কোয়ান্টাম জগতে বিভিন্ন পথিকৃৎ গবেষণা সম্পন্ন করা যা কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানের মূল ভিত্তির ওপরেই আলোকপাত করতে পারবে বলে আশা করা যায়।

২০১২ সালে সার্জ হারোস এবং ডেভিড ওয়াইনল্যান্ড তাঁদের প্রাতিষিক কোয়ান্টাম ব্যবস্থার ওপর পরিমাপনে এবং তার দ্বিগুণ পরিচালনা সংক্রান্ত গবেষণার জন্যই আজ পৃথিবী বিখ্যাত। তাদের গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত দুটি পৃথক কিন্তু পরস্পর সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি যার একটি হল ঐক্যতানীর (Harmonic) ফাঁদ তৈরি করা যেখানে একটি আয়ন আটকানো বা আবদ্ধ করা হয় এবং অন্য প্রযুক্তি হল শূন্যস্থানীয় গহবরে (Empty cavity) সৃষ্ট যেখানে আলোক কণাকেই আটকানো হয়।

এই দুটি পদ্ধতির মধ্যে বেশ কিছু আকর্ষণীয় সাদৃশ্য রয়েছে যার এই গবেষণা অধুন পদার্থবিজ্ঞানে গবেষণায় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। উভয়ক্ষেত্রে ক্ষণভঙ্গুর (Fragile) কোয়ান্টাম অবস্থা সৃষ্টি করা হয়। এটি হয় কোয়ান্টাম অবিনাশী পরিমাপন (Non-destructive measurement) পদ্ধতির মাধ্যমে। এই পদ্ধতিতে একটি দ্বিগুণ বিশিষ্ট ব্যবস্থা (Two level system)-কে সংযোজিত (Couple) করা হয় একটি কোয়ান্টায়িত ঐক্যতানীয় বাষ্পাঙ্ক (Harmonic oscillator) এর সঙ্গে। কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানে এ ধরনের ব্যবস্থাকে বলে জেইন্স কামিংস (Jaynes-Cummings) হ্যামিল্টনীয় অপেক্ষকের ব্যবস্থা।

দ্বিস্তর বিশিষ্ট ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত একটি আয়নের দুটি পৃথক শক্তিস্তর থাকে যা সংযোজিত হয় লেজার ক্ষেত্রের বিদ্যুৎ-চৌম্বক পরিমণ্ডলের মাধ্যমে। বিকল্পে তারা পরস্পর সংযোজিত হয় উত্তেজিত পরমাণুর বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় মাইক্রোটরঙ্গের পরিমণ্ডলের মাধ্যমে। কোয়ান্টায়িত ঐক্যতানীর কম্পক ফাঁদে আবদ্ধ আয়নের অথবা মাইক্রোটরঙ্গের গহবরে আবদ্ধ ফোটনের ওপরে যা এভাবেই মাপা এবং নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে। এই পরীক্ষণের মূল ধারণা নিচের চিত্রে মোটামুটিভাবে দেখানো হয়েছে।

চিত্র-প্রাতিষিক কোয়ান্টাম-ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ



ঐক্যতানীয় ফাঁদে আবদ্ধ আয়ন। তার কোয়ান্টাম অবস্থা (অভ্যন্তরীণ ও গতিময় উভয়ই) নিয়ন্ত্রিত হয় লেজার স্পন্দনের সঙ্গে বিক্রিয়ার মাধ্যমে যা চিত্রে Be<sup>+</sup> আয়ন সরবরাহ করে

একটি ফোটন আবদ্ধ একটি উচ্চ-Q সম্পন্ন মাইক্রোটরঙ্গ গহবরে। ঐ ক্ষেত্রের অবস্থা মাপা এবং নিয়ন্ত্রিত হয় অতি উচ্চ মানের উত্তেজিত অবস্থায় Rb পরমাণুর সঙ্গে বিক্রিয়ার মাধ্যমে।

দ্বিস্তর বিশিষ্ট ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত আয়নের দুটি পৃথক শক্তিস্তর পরস্পর সংশ্লিষ্ট হয় লেজার আলোর মাধ্যমে অথবা একটি উত্তেজিত পরমাণুর মাধ্যমে যার দুটি রিডবার্গ শক্তিস্তর (Rydberg level) পরস্পর সংযোজিত হয় বিদ্যুৎ-চৌম্বকীয় মাইক্রো তরঙ্গ ক্ষেত্রের মাধ্যমে কোয়ান্টায়িত কম্পক বর্ণনা করে ঐ ফাঁদে আবদ্ধ আয়নের অথবা মাইক্রোটরঙ্গের ক্ষেত্রে শূন্যস্থান গহ্বরে রাখা ফোটনের কোয়ান্টায়িত প্রকৃতি (চিত্র দেখুন)। শূন্যস্থানের গহ্বরে ফোটন যে দূরত্ব অতিক্রম করে তা পৃথিবীর পরিধির সমান এবং এই দূরত্ব অতিক্রম করার পর তা অদৃশ্য হয়ে যায় অর্থাৎ এর শূন্যস্থান ফোটন-বাক্সে ফোটনের প্রকাশ হওয়ার পর বাক্সের দেয়াল থেকে বিকিরণ নিঃসরণ কেননা দর্পনের অতিরিক্ত তাপমাত্রায় তাদের পরমাণুর থাকে কিছু অবশিষ্ট (Residual) তাপীয় উত্তেজনা যা সৃষ্টি করে ফোটনের নিঃসরণ। এই কৃষ্ণ-বস্তু বিকিরণ নিয়ে গবেষণা করেছিলেন মাক্স প্র্যাংক, আলবার্ট আইনস্টাইন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিগত শতাব্দীর গোড়ার দিকে। এই তিনজনের যুগান্তকারী তিনটি প্রবন্ধ বলা হয় পদার্থ বিজ্ঞানের কোয়ান্টাম বিপ্লবের সূত্রপাত চিহ্নিত করে।

## (২.২) ফাঁদে আবদ্ধ একক ফোটনের নিয়ন্ত্রণ

ফাঁদে আবদ্ধ ফোটনের নিয়ন্ত্রণ গবেষণার নাম গহ্বর কোয়ান্টাম গতিবিদ্যা (Cavity quantum electrodynamics, CQED) যা শুরু হয়েছিল ১৯৮০ সালের দিকে পরমাণুর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে গবেষণা করার সময়ে বিশেষ করে স্বতঃস্ফূর্ত ফোটন নিঃসরণ গবেষণায়। এই নিঃসরণ প্রবাহিত হয় পরমাণুটি আলোকায়িত অথবা মাইক্রোটরঙ্গের শূন্যস্থানে গহ্বরে রাখার ফলে। স্বতঃস্ফূর্ত নিঃসরণ অবদারিত হয় যখন গহ্বরের আকার নিঃসৃত আলোক-তরঙ্গের সঙ্গে তুলনীয় হয় যা প্রথম লক্ষ্য করেছিলেন হিউলেট (Hewlett) এবং অন্যায়ের (১৯৮৫), হারোস এবং অন্য সদস্যরা (১৯৮৭) ও ডিমাটিক এবং অন্যায়রা (১৯৮৭)। এই গবেষণার পরবর্তী পদক্ষেপ ছিল ফোটন অনুযায়ী (Resonant) গহ্বরে আলোক রশ্মির বিবর্ধন (Enhancement) যে গবেষণায় মাইক্রো-তরঙ্গের প্রথম ব্যবহার করেছিলেন হারোস এবং তাঁর সহকর্মীরা।

সার্জ হারোস এবং তাঁর গবেষকদলের প্যারিসের গবেষণাগারে মাইক্রোটরঙ্গ ফোটন তিন সেন্টিমিটার দূরত্বে রাখা দুটি দর্পনের মধ্যে এপাশ-ওপাশ যাওয়া-আসা করে। দর্পন দুটি তৈরি করা হয়েছিল পরম পরিবাহী (Super conduction) বস্তু দিয়ে এবং তা শীতল করা হয়েছিল পরম শূন্য তাপমাত্রার সাহায্যে উর্ধ্বের তাপমাত্রায়। এই পরম পরিবাহী দর্পন সেই সময়কার পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা প্রতিফলন ক্ষমতার দর্পন যার প্রতিফলন ক্ষমতা এত বেশি ছিল যে, একটি পতিত ফোটন গহ্বরে এপাশ-ওপাশ যাওয়া-আসা করেছিল এক সেকেন্ডের এক দশমাংশ সময়ে। ফোটনের পরমাণুর এই রেকর্ডের তাৎপর্য এই যে ফোটনিক ভ্রমণ করেছিল ৪০,০০০ কি.মি. অর্থাৎ পৃথিবীর চারদিকে একবার ঘুরার সময় নিয়েছিল। এই দীর্ঘ জীবনকালে আবদ্ধ একক ফোটন নিয়ে অনেক পরীক্ষা করা যায়। ফোটনের দীর্ঘ জীবনকাল শুধু একারণেই ব্যতিক্রমী নয়। মুক্ত মহাকাশে ফোটন বেঁচে থাকে অনন্তকাল। বিশ্বের দূরপ্রান্ত থেকে যে আলোকরশ্মি আমরা পাই তা মহাবিশ্বের শূন্যস্থান দিয়ে ভ্রমণ করে আসে শতশত কোটি বছর ধরে। কিন্তু একটি আবদ্ধ ফোটনকে সঞ্চয় করে রাখা দুরূহ। সঞ্চয়ের পরে এই ফোটন একটি বস্তুনির্মিত মাধ্যমের সঙ্গে বিক্রিয়া করে কোন গহ্বরের প্রতিফলন-ক্ষম দেয়াল অথবা কোন আলোকীয় তন্তু (Optical fibre) এর স্বচ্ছ প্লাস্টিক। এই অবস্থায় ফোটনটি সহজেই শোভিত হয় এবং তা ভঙ্গুরও হয়ে যায়। সার্জ হারোসের পরম পরিবাহী বাক্সে যে আলোক কণাগুলো সঞ্চয় করে রাখা হয়েছিল তারা কোন ক্ষুদ্র আয়তনে আটকানো আলোক-কণার দীর্ঘ জীবনকালের বিশ্ব রেকর্ড অর্জন করেছিল।

এই ফোটন “দেখার” জন্য গবেষকেরা একাধিকবার ফোটন পাঠিয়েছিলেন রুশিয়ার পরমাণুর গহ্বরের ওপর দিয়ে। যেখানে ঐ পরমাণুগুলি অত্যন্ত উত্তেজিত অবস্থায় থাকে যাকে বলে রিডবার্গ (Rydberg) অবস্থা। পারমাণবিক ইলেকট্রনের কোন একটি লেজার উত্তেজনার মাধ্যমে বৃহৎ আকৃতির কক্ষপথে চলে যায় যার ব্যাসার্ধ একহাজার গুণ বেশি সাধারণ পারমাণবিক সর্বনিম্নাবস্থায় ইলেকট্রনীয় কক্ষপথের তুলনায়। এই অত্যন্ত উত্তেজিত পরমাণু একটা “দানব” (Giant) অ্যান্টেনা হিসেবে কাজ করে যা মাইক্রোটরঙ্গ বিকিরণের জন্য অত্যন্ত সংবেদী। এই পরমাণু ফোটনটি “ধরার” কাজে ব্যবহার করার সহজ উপায় হল আলোক কোয়ান্টামকে শোষণ



করানো যখন তা অনুনাদী রূপান্তর ঘটায় একটি আদি বিরুদ্ধার্থ অবস্থা থেকে এই বিষয়ে উত্তেজিত অবস্থায় রূপান্তরের সাধ্যমে। চূড়ান্ত পারমাণবিক শক্তি মেপে আমরা এখন পাই ফোটনের উপস্থিতি। একই পদ্ধতিতে ফোটন শোষিত হয় অর্থাৎ তার বিনাশ ঘটে। একটি নতুন মাধ্যম তখন আমাদের সুনিশ্চিত করে যে পরবর্তী বস্তুটি শূন্য। এভাবেই একক ফোটনের জীবন-মৃত্যু আমরা আমাদের গবেষণাতেই “দেখতে” পারি।

এই নতুন অবিনাশী পদ্ধতি কোয়ান্টাম প্রক্রিয়ার একটা মৌলিক ব্যাপার দেখায় যা এর পূর্বে কখনও আলোর ক্ষেত্রে দেখা যায়নি। এই সর্বপ্রথম ফোটন যে তথ্য-উপাত্ত বহন করে নিয়ে আসে তাই বৃহৎ আকারে পরমাণু সঙ্গে অংশিদারিত্বে যোগ দিতে পারে যারা বিকিরণ ক্ষেত্রের সঙ্গে একটার পর একটা বিক্রিয়া করতে পারে।

এভাবেই সম্ভব হয় এমন একটা অবস্থার বাস্তবায়নে যেখানে গহ্বরটি হয়ে যায় দুটি অবস্থার সমাবেশ যার একটি শূন্যস্থান এবং অন্যটিতে থাকে একটি মাত্র ফোটন। এটা অর্জন করতে আমরা প্রথমে গহ্বরের উপর দিয়ে একটা অনুনাদী পরমাণু প্রেরণ করি, তার ক্ষেত্রের সঙ্গে বিক্রিয়ার সময় এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করি যাতে তার থেকে একটি ফোটনের নিঃসরণের সম্ভাবনা শতকরা ৫০। পরবর্তী পরমাণুগুলো তাই সুর-লয় বঞ্চিত হয় যাতে কিউএনডি শনাক্তকরণ বাস্তবায়ন করা হয়। সবশেষ তারা হয়ে যাবে দুটি অসম্ভব সমাবেশ যার একটিতে সর্বদাই এক ধরনের (অর্থাৎ যা অন্যটিতে সর্বাধিকই একধরনের (অর্থাৎ g)। এই অভূত সমূহের প্রদর্শন করে কোয়ান্টাম সার্থকতা যা বিখ্যাত শোভিজ্জার মার্জারের সঙ্গে তুলনীয় যেখানে একটি একক পরমাণুর সঙ্গে বিক্রিয়া করে পর্যবসতি এর চূড়ান্ত পর্যায়ে একই সময় জীবিত অথবা মৃত উভয়ের সমাহার। এই ধরনের অবস্থার পর্যালোচনা থেকে কোয়ান্টাম জগত এবং চিরায়ত জগতের মধ্যে অস্পষ্ট সীমানা রেখার প্রবৃত্তি সন্দেহে বহুযথ ধারণা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে।

(চলবে)

অধ্যাপক এ.এম. হারুন অর রশীদ  
প্রাক্তন অধ্যাপক  
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়  
ঢাকা



## সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্ব

অনাদিকাল ধরে মানুষ ভেবে এসেছে কতিপয় সৌর জাগতিক বস্তু ছাড়া অনড় আমাদের নভোমণ্ডল। নিতান্ত চর্ম চক্ষের মানুষ নিজের মহিমা জাহির করতে পৃথিবীর ঠিকানা করেছে মহাবিশ্বের কেন্দ্রে। কালের বিবর্তনে বিজ্ঞানের প্রসারণী দর্শন ও প্রযুক্তির প্রসারণী দৃষ্টিশক্তি বিবর্ধিত হওয়ার সুবাদে নভোমণ্ডলগত ধারণা আমূল বিবর্তনের পথ ধরে চলতে থাকে, সে পথে পৃথিবীর ঠিকানা মধ্যাঞ্চল স্ফীত চাকতি আকৃতির ছায়াপথ নামক কোন অর্বাচীন গ্যালাক্সির কেন্দ্র থেকে যথেষ্ট মফস্বল অঞ্চলে থেকে প্রদক্ষিণরত নগণ্য সৌরজগতের অভ্যন্তরস্থ তাচ্ছিল্যকর সূর্য নামক নক্ষত্রের চারিদিকে প্রদক্ষিণরতা কোন নীল গ্রহের মর্যাদায় সমাসীন। বিজ্ঞানের আলোক তাঁর নিজস্ব পথে চলতে চলতে জানান দিচ্ছে যে, প্রায় সাড়ে তের শত কোটি বছর পূর্বে বিশাল তেজময় বিস্ফোরণের মাধ্যমে আমাদের চৈতন্যে অনুভূত স্থা-কালের যাত্রা তথা দৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডের শুভ সূচনা। সেই থেকে সম্প্রসারণ যা আজও বিদ্যমান। হাবলের পর্যবেক্ষণে উঠে আসে; সম্প্রসারণশীল বেলুন তলে বা দ্বি-মাত্রিক তলে অবস্থানরত বিন্দুদের অপসারণের ন্যায় চতুর্মাত্রিক মহাকাশে গ্যালাক্সিগুলো অপসৃয়মানতা। এ পর্যায়ে স্মর্তব্য যে, রূপকল্প হিসেবে বিশাল মহাসাগররূপী মহাবিশ্বে সনাক্তযোগ্য ভাসমান ক্ষুদ্রতম বস্তু হিসেবে গ্যালাক্সিদের মর্যাদা মাত্র। সম্প্রসারণের স্বপক্ষে রয়েছে আরও অকাট্য প্রমাণ; দিক-নিরপেক্ষভাবে চতুর্দিক থেকে ধেয়ে আসছে মোটামুটি সুযম সৃষ্টি বেতার তরঙ্গের মহাজাগতিক বিকিরণ। আরও রয়েছে মানুষের মনে বাসা বাধা দ্ব্যর্থক-প্রশ্ন: রাতের আকাশ কেন কালো? এসব মহাজাগতিক পর্যবেক্ষণ মিলে যায় সাধারণ আপেক্ষিকতার আলোকে উপনীত সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্বের পথে সমর্থন যোগাতে। সাধারণ আপেক্ষিকতা হলো চতুর্মাত্রিক বস্তুজগতের পানে চেয়ে পর্যবেক্ষণগত একটি উপলব্ধি বা দর্শন যাতে দেখা হয়: বস্তুজগতের সকল কাঠমোর জন্য পদার্থ বিজ্ঞানের তাবৎ নীতি অভিন্ন এবং এমনকি মহাকর্ষীয় কিংবা জাড্য কারণে উদ্ভূত ত্বরণের অনুভবে প্রভেদ করা চলে না। মানুষের মন যেহেতু স্থির নয়, চিরচঞ্চলমান অনুসন্ধিৎসা সততভাবে খুঁজে পেতে চায় প্রকৃতির অধিকতর কাছের দর্শনকে। তবে বলে রাখা দরকার যে, প্রকৃতিও কম মায়াবী নয়, সেও অধরা থাকতে চায় তার স্বকীয় ছলা-কলা-মুদ্রা-অঙ্গভঙ্গি-সুর-তাল-লয়ে। মানুষ এই মায়াবী স্বর্ণ হরিণরূপী প্রকৃতির পিছে সম্ভাবনারূপী দর্শনের মাধ্যমে তাকে খুঁজে ফেরার পায়তারায় লিপ্ত থাকে। যাইহোক, পর্যবেক্ষণ ও দর্শনের সম্প্রসারণশীল জ্ঞান আমাদের জানান দেয় মহাকর্ষীয় প্রভাবাধীন মহাবিশ্ব চতুর্ভূতে গড়; পারমাণবিক বস্তু, আলোকে অ-গোচরীভূত শীতল বস্তু, বিপুল পরিমাণ অ-গোচরীভূত শক্তি ও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র তেজ-কণা বা নিউট্রিনো। এদের মধ্যে অ-গোচরীভূত শক্তি ত্বরণশীল সম্প্রসারণের পক্ষে সতত কার্যে লিপ্ত। মহাকর্ষের অমোঘ ফল বস্তু বা শক্তি পুঞ্জের উপস্থিতি স্থান-কালকে বাঁকিয়ে দেয়া। ফলত: জ্যামিতিক বিচারে ঘটনা-দিগন্তের আঙ্গিকে পর্যবেক্ষণ-ক্ষম মহাবিশ্বের ধারণা এসে যায়। তাইতো মানব হৃদয় পর্যবেক্ষণ-ক্ষম মহাবিশ্বের ঘটনা-দিগন্তের বাইরে প্রকৃত ব্রহ্মাণ্ডের সন্ধান পায় অসীমতার আহ্বানে।

প্রকৌশলী সুকল্যাণ বাছাড়  
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর  
ঢাকা

## পাতি গেছো ব্যাঙ

আমাদের গ্রামাঞ্চলের বাঁশঝাড় বা কলা গছে সন্ধ্যা হলেই এক ধরনের ব্যাঙের শব্দ প্রায়ই শোনা যায় যা 'পাতি গেছো ব্যাঙ' নামে পরিচিত। এর ইংরেজি নাম Comoon Tree Frog/Four-lined Tree Frog, বৈজ্ঞানিক নাম *Polypedates leucomystax*। এটি Rhacophoridae গোত্রের বন জঙ্গলের অতি পরিচিত একটি ব্যাঙ। *P. Leucomystax* বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলেই পাওয়া যায়। বাংলাদেশ ছাড়া ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, চীন, মায়ানমার, মালয়েশিয়া থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত এরা বিস্তৃত।

*P. Leucomystax* সাধারণত কলা গাছের পাতার গোড়ার ফাঁকে, পাথরের ফাঁকে, ঘাস অথবা গাছের ছিদ্রে থাকতে পছন্দ করে। এরা খুবই অলস প্রকৃতির। কখনও একই জায়গায় প্রায় এক ঘন্টা নিষ্ক্রিয় অবস্থায় কাটিয়ে দিতে পারে।

এরা নিশাচর। দিনের বেলায় এরা শরীরের নিচে পা ঢুকিয়ে পাথর বা ইটের ফাঁকে, ঘাসের নিচে, বাঁশ গাছের ফাঁকে অথবা পাতার নিচে বিশ্রাম করে, সন্ধ্যার কিছু আগে আবার সক্রিয় হয়ে উঠে। এরা পতঙ্গভুক ব্যাঙ। গাছের এক শাখা থেকে অন্য শাখায় সহজেই এরা লফিয়ে চলতে পারে।

পুরুষ ব্যাঙ লম্বায় প্রায় ৪.৫ সে.মি., স্ত্রী ব্যাঙ প্রায় ৮ সে.মি.। এদের শরীর লম্বা, পাতলা, মাথা বড়, মুখমণ্ডল সূঁচালো, পা লম্বা ও পাতলা ধরনের। এদের পিঠের চামড়া পাতলা, গাঢ় বাদামী থেকে হলুদ বর্ণের হয়ে থাকে। ৩-৪ টি গাঢ় লম্বার দাগ ঘাড় থেকে পিঠের উপর দিয়ে পিছন পর্যন্ত চলে গেছে। কখনও কখনও অতিরিক্ত ১টি বা ২টি লম্বা দাগ পিঠের মাঝ বরাবর দেখা যায়। তাই কখনও কখনও এটি Six-lined Tree Frog নামে পরিচিত। কখনও পিঠে ও পিছনের পায়ের উরুতে সাদা ছোপ ছোপ দাগের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। পেট, গলা এবং উরুর নিচের অংশ সাদা। বিশ্রামের অবস্থায় এদের ঘাড়ের পিছনে স্পষ্ট 'W' আকারের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। এদের পা ও আঙ্গুল গাছের শাখা ও পাতায় উঠার জন্য অভিযোজিত এবং প্রতিটি আঙ্গুলের প্রান্তে গোলাকার চাকতি রয়েছে। আঙ্গুলের গোড়ার দিকের কিছু অংশ পর্দায়ুক্ত। পুরুষ ব্যাঙে একটি করে 'vocal sac' রয়েছে।



এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর মাস এদের প্রজননকাল। যদিও এরা সারাজীবন গাছে গাছে কাটায়, কিন্তু ডিম পাড়ার সময় পুরুষ ও স্ত্রী ব্যাঙ স্থির পানির উপর ঝুলন্ত কোন গাছের পাতার কাছে চলে আসে। পাতার নিচে পুরুষ ও স্ত্রী ব্যাঙ আঠালো ফোমের মত বাসা তৈরি করে। পরে সেখানে স্ত্রী ব্যাঙ ডিম পাড়ে। সাধারণত রাত ৯টা থেকে ১১টার মধ্যে ডিম পাড়ার কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকে। সদ্য ফোমের রং হালকা গোলাপী হয়ে থাকে, কয়েক ঘন্টার মধ্যে ফোমের নীচের অংশ গাঢ় নীল বর্ণ থেকে সবুজ বর্ণ ধারণ করে। প্রতিটি ফোমের বাসায় স্ত্রী ব্যাঙ প্রায় ১০০-৪০০টি ডিম পেড়ে থাকে। ৬০-৯৬ ঘন্টায় ডিম থেকে ব্যাঙাচি বের হয়ে আসে এবং পাতার

নীচের বাসা থেকে পানিতে লাফিয়ে পড়ে। পানিতে পড়ার পর ব্যাঙাচিগুলো কিছুসময় স্থির হয়ে থাকে, এরপর দ্রুত সাঁতার কাটতে শুরু করে। সদ্য প্রস্ফুটিত ব্যাঙাচির মুখ থেকে লেজ পর্যন্ত দৈর্ঘ্য ৯-১১ মি.মি. হয়ে থাকে এবং রূপান্তরের (Metamorphosis) পর প্রায় ৫.৫ সে.মি. পর্যন্ত হয়ে থাকে। ৩ সপ্তাহ থেকে ২ মাসের মধ্যে রূপান্তরের কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকে। রূপান্তরের সময় ব্যাঙাচির বৃদ্ধি এর খাদ্য প্রাপ্যতার উপর নির্ভর করে। ব্যাঙাচি সাধারণত পানির নিচে নরম শৈবাল এবং প্র্যাংকটন খেয়ে বেঁচে থাকে। ব্যাঙাচি ছোট্ট ব্যাঙে রূপান্তরের পর এরা পানির উপর চলে আসে। এসময় এদের রং বাদামী থেকে হলুদাভ বাদামী হয়ে থাকে।

এরা পোকামাকড় খেয়ে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে। ক্ষতিকর পোকার হাত থেকে আমাদের ফসলকে রক্ষা করে থাকে। তাই এদের রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের সকলের।

শওকত ইমাম খান  
সহকারী কিপার (চ.দা.)  
প্রাকৃতিক ও ইতিহাস বিভাগ  
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর  
ঢাকা

## উইন্ডমিল : নবায়নযোগ্য শক্তির এক সম্ভাবনাময় উৎস

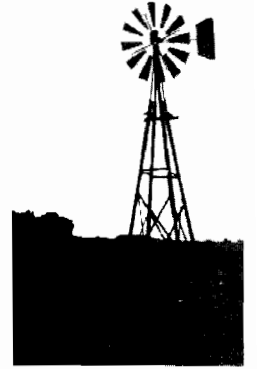
মানব সভ্যতা যত এগিয়ে যাচ্ছে, শক্তির চাহিদা ততই বাড়ছে। শক্তি ছাড়া কোন কিছুই ব্যবহার করা যায় না। বায়ু হল শক্তির একটি উৎস।

উইন্ডমিল বা বায়ুকল এমন একটি যন্ত্র যা বায়ুশক্তিকে কাজে লাগিয়ে যান্ত্রিক বা বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করে। শস্য মাড়াই, পানি উত্তোলন এবং তড়িৎ উৎপাদনে এটি বহুলভাবে ব্যবহৃত একটি যন্ত্র।

খ্রিস্টাব্দ প্রথম শতাব্দীতে আলেকজান্দ্রিয়ার বিজ্ঞানী হেরন এর ব্যবহৃত বায়ু চালিত চাকাই হল বায়ুকলের সর্বপ্রাচীন নিদর্শন। এছাড়া প্রাচীন চীন এবং তিব্বতে এর ব্যবহার প্রচলিত ছিল চতুর্থ শতাব্দী হতে। অতঃপর মধ্যযুগ পেরিয়ে বর্তমান আধুনিক যুগেও এটি ব্যবহৃত হচ্ছে।

বায়ুকলে ব্যবহৃত গিয়ার পাখার ঘূর্ণন গতি হতে শক্তি নিয়ে তা বায়ুকলের ভিতরে পাঠায়। বায়ুকলের উপরিভাগে অবস্থিত কাঠামোর সাথে আনুভূমিকভাবে পাখাগুলো যুক্ত থাকে। এ কাঠামোটি কাঠ বা ঢালই লোহা দিয়ে বানানো হয়। ভিতরে এ বায়ুশক্তিকে কাজে লাগিয়ে তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করা হচ্ছে।

অতীতে বায়ুকল গম ও যব ভাঙ্গানো, কৃষি সেচ, আখ মাড়াই, ধান ও খড় কাটা ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত হত। বর্তমানে পরিবেশবান্ধব উপায়ে তড়িৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত হচ্ছে। একটি বায়ুকল হতে বর্তমানে প্রায় ৭ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। এ হতে বিশ্বে ১৯৪,৪০০ মেগাওয়াট বিদ্যুতের চাহিদা মেটানো হয়। যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া, ডেনমার্ক ইত্যাদি দেশে তড়িৎ উৎপাদনে বায়ুকল বহুলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ইউরোপে বর্তমানে প্রায় ২০০,০০০টি বায়ুকল চালু আছে। নেদারল্যান্ডস এ বর্তমানে ১০০০টি বায়ুকল চালু আছে, ব্রিটেনে ৫০টি চালু আছে।



বায়ুকল

কাঠ, কয়লা, তেল, গ্যাস, ইত্যাদি আমাদের শক্তি সরবরাহ করলেও এগুলো সীমিত এবং অনেকক্ষেত্রে পরিবেশ দূষণে দায়ী। অপরদিকে, বায়ুকলের ব্যবহার পরিবেশবান্ধব এবং তা হতে বিপুল পরিমাণ তড়িৎ উৎপাদন সম্ভব।

কাজেই, অন্যান্য উন্নত দেশের মত বাংলাদেশের জন্যও বায়ুকল হতে পারে শক্তির একটি উল্লেখযোগ্য উৎস।

ফারিয়াল মাহমুদ তিশান  
রোড নং-১০, বাসা নং-৩০ (২য় তলা)  
ডি.আই.টি প্রজেক্ট  
বাড্ডা, ঢাকা

## বুদ্ধি

বুদ্ধি মানুষের জীবনে অতি পরিচিত একটি শব্দ। একটি শিশুর বাহ্যিক চালচলনে, আচার ব্যবহারে, কথাবার্তায়, কোন সমস্যা সমাধানের দক্ষতা দেখে আমরা বলে থাকি শিশুটি বুদ্ধিমান। আবার এর বুদ্ধি বিকশিত হবার জন্য পরিবেশ, পরিস্থিতির প্রয়োজন হয় অথবা বিজ্ঞ বনের ফুলের মত লোক চক্ষুর অন্তরালে ঝরে যায়। বহু গবেষক বুদ্ধির উপর গবেষণা করে এর কতিপয় সংজ্ঞা দেবার চেষ্টা করেছেন। যেমন-টারম্যান বলেন, বুদ্ধি হল মানুষের মানসিক একটি শক্তি যার দ্বারা সে বিমূর্ত চিন্তা করতে পারে। আবার থর্নডাইকের মতে, বিভিন্ন ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে একটি সঠিক প্রতিক্রিয়া আসতে পারা। এ ক্ষমতা শুধু মানুষের বুদ্ধির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়। বুদ্ধিমান প্রাণীদের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করে তিনি পরীক্ষা করে প্রমাণ করেছেন। তাই বলা হয় বুদ্ধি হলো শেখার ক্ষমতা যা কোন সমস্যার মুখোমুখি হয়ে তার সমাধানের শক্তি অর্জন করা।

উডওয়ার্থ বলেন, বর্তমান কোন সমস্যার সমাধানের অতীতের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাবার ক্ষমতাকে বুদ্ধি বলে।

বর্তমান সময়ে বিভিন্ন গবেষণা থেকে যা উঠে এসেছে তার থেকে বোঝা যায় বুদ্ধি হল একটি জন্মগত মানসিক প্রতিক্রিয়া। এই মানসিক প্রতিক্রিয়া পরিবেশ পরিস্থিতি হতে জ্ঞান অর্জনের ফল বুদ্ধি পায় অথবা তার অভাবে বোঝা হয়ে যায়।

চিকিৎসা বিজ্ঞানী বা মনোবিজ্ঞানীদের সর্বজনীন স্বীকৃত কোন তত্ত্ব (Theories of Intelligent) নেই। মানসিক শক্তি সম্পর্কে এই দুইজন স্বীকার করেছেন কিন্তু বুদ্ধি একক শক্তি অথবা কতিপয় শক্তি, না বহু শক্তি এ নিয়ে তাদের মধ্যে গড়ে উঠেছে বুদ্ধির বিবিধ মতবাদ। এই মতবাদগুলোকে বিজ্ঞানীরা দুই ভাগে ভাগ করেছেন :

ক) বুদ্ধির প্রাচীন ধারণা

খ) বুদ্ধির আধুনিক ধারণা

বুদ্ধির প্রাচীন ধারণাকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন যেমন -

(১) বুদ্ধি রাজতন্ত্রমূলক ধারণা : বুদ্ধি একক শক্তি এবং এর অধীনে অন্যান্য শক্তি প্রজা হিসেবে কাজ করে।

(২) বুদ্ধির অভিজাত তত্ত্ব : বুদ্ধি হল কতিপয় বিশেষ শক্তির সমন্বয়। এ শক্তিগুলো একত্রিত হয়ে মানসিক কার্যকলাপকে চালায়।

(৩) গণতন্ত্রমূলক তত্ত্ব : মনোবিজ্ঞানীর গণতন্ত্রমূলক ধারণায় বুদ্ধিকে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তির সংমিশ্রণ বলে মনে করেন।

বুদ্ধির সমসাময়িক কালের ধারণা :

(১) স্পীয়ারম্যানের দ্বি-উপাদান তত্ত্ব : ব্রিটিশ মনোবিজ্ঞানী স্পীয়ারম্যানের মতে বুদ্ধিদীপ্ত কোন কাজে দুই প্রকারের মানসিক শক্তির উপস্থিতি থাকে। এর প্রথমটি হল G এবং এটি একটি সাধারণ শক্তি। এর দ্বিতীয়টি হল একটি বিশেষধর্মী শক্তি। স্পীয়ারম্যান এটির নাম দিয়েছেন S। তার মতে G ও S এর সমন্বয়ে বুদ্ধির বিকাশ হয়।

G শক্তিটি সকল প্রকার কাজের মধ্যেই উপস্থিত থাকে। তবে বিভিন্ন প্রকার কাজের গুণাগুণের তারতম্যের কারণে এর পরিমাণ ভিন্ন হবে।

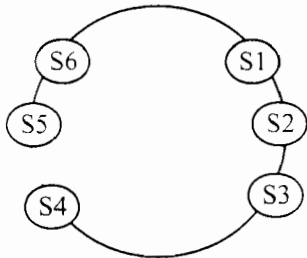
S কোন বিশেষ কাজের জন্যই নিয়োজিত শক্তি। যেমন-পড়ার জন্য, অঙ্ক করার জন্য, ফুটবল খেলতে S ব্যবহার হয়ে থাকে।

স্পীয়ারম্যানের মতে প্রত্যেক মানুষ G এর নিজস্ব একটি ভান্ডার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং যে কোন কাজ করতে গিয়ে সে প্রয়োজন মত কিছুটা G শক্তি গ্রহণ করে। যেমন-অঙ্ক করার জন্য প্রয়োজনীয় G এর অংশ এবং



অঙ্ক করার জন্য বিশেষ শক্তি S প্রয়োগ করতে হয়।

অঙ্ক করতে G এর কিছুটা + অঙ্কের S শক্তি প্রয়োগ করতে হয়। স্পীয়ারম্যানের মতে সমস্ত মানসিক প্রক্রিয়ার মূল দুটি উপাদান বর্তমান বলে এই মতবাদটির নাম দিয়েছেন দ্বি-উপাদান তত্ত্ব।



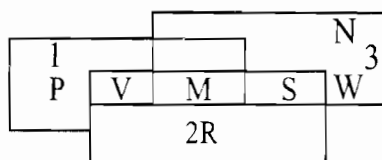
এরও পরে গবেষকগণ বুদ্ধি শক্তির উপর গবেষণা করে আরো কিছু প্রমাণ পেয়েছেন। স্পীয়ারম্যান নিজের, থমসন, থার্সটনের গবেষণায় প্রমাণিত হল সাধারণ মানসিক শক্তি G এবং বিশেষ মানসিক শক্তি S ছাড়াও এমন কতক শক্তি আছে যা এই G ও S এর মধ্যবর্তী। এগুলি বিশেষ এক গোষ্ঠীভুক্ত কাজ করতে অংশগ্রহণ করে। এগুলো G এর মতো ব্যাপকও নয় আবার S এর মতো সীমাবদ্ধও নয়। বিশেষ বিশেষ নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর কার্যক্ষেত্রে এগুলো দরকারী বলে এদের বলা হয় গোষ্ঠী উপাদান।

স্পীয়ারম্যানের দ্বি-উপাদান তত্ত্বের চিত্ররূপ (২) থার্সটনের প্রাথমিক শক্তিতত্ত্ব : থার্সটন একজন মার্কিন মনোবিজ্ঞানী। তিনি যেমন বুদ্ধির একক শক্তিতে বিশ্বাসী নন তেমনি স্পীয়ারম্যানের দ্বি-উপাদান তত্ত্বও অস্বীকার করেছেন। পরে তিনি বুদ্ধির সাতটি মৌলিক বা প্রাথমিক উপাদান তথ্য-শক্তির কথা বলেন। যথা -

- (১) ভাষা-Verbal Factor (V)
- (২) সংখ্যা-Number Factor (N)
- (৩) অবস্থান উপাদান-Space Retention (S)
- (৪) স্মৃতির উপাদান-Memory (M)
- (৫) বিচারমূলক উপাদান-Reasoning (R)
- (৬) উপলব্ধি ক্ষমতা-Perceptual Speed (P)
- (৭) শব্দ ব্যবহারের স্বাচ্ছন্দ-Word Fluence (W)

এই সাতটি মৌলিক শক্তিকে থার্সটন বুদ্ধির সম্মিলিত রূপ বলেছেন। সব কাজে সবকটি শক্তিই সবসময় নাও হতে পারে। উপরন্তু কোন কাজেই তাদের পরিমাণও সুনির্দিষ্ট বা আনুপাতিক নয়। বিশেষ কয়েকটি শক্তি একত্রিত হয়ে বিশেষ একটি কাজ সম্পন্ন করে। আবার এদের মধ্য হতে অন্য কয়েকটি শক্তি একত্রিত হয়ে অন্য আরেকটি কাজ সম্পন্ন করে।

সবসময় দরকার নাও হতে পারে। উপরন্তু কোন কাজেই তাদের পরিমাণও সুনির্দিষ্ট বা আনুপাতিক নয়। বিশেষ কয়েকটি শক্তি একত্রিত হয়ে বিশেষ একটি কাজ সম্পন্ন করে। আবার এদের মধ্য হতে অন্য কয়েকটি শক্তি একত্রিত হয়ে অন্য আরেকটি কাজ সম্পন্ন করে।



থার্সটনের প্রাথমিক শক্তি তত্ত্বের চিত্র

থার্সটনের প্রাথমিক শক্তিতত্ত্বের চিত্রে দেখা যাচ্ছে ১নং কাজে P.V.M ২নং কাজে R.V.M.S এবং ৩নং কাজে M.S.W.N উপাদানগুলো কাজে লেগেছে। কোন কোন প্রাকৃতিক শক্তি সম্মিলিত হবে তা কাজের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে।

থমসনের বাছাই তত্ত্ব : ব্রিটিশ মনোবিজ্ঞানী থমসন স্পীয়ারম্যানের দ্বি-উপাদানতত্ত্ব এবং থার্সটনের প্রাথমিক শক্তি তত্ত্ব দুটিকে মেনে নেননি। তিনি তৃতীয় একটি ব্যাখ্যা বলেন, বুদ্ধির কোন একটি একক শক্তি নেই। বরং

মানুষের মনোজগতে অগণিত শক্তি কণা বিরাজমান। এই শক্তি কণিকাগুলোর কোন নির্দিষ্ট প্রকৃতি, বর্ণনা বা সংজ্ঞা দেয়া যায় না। তাই, এগুলিকে মানুষের মানসিক শক্তির একক বলা যায়। মানুষ যখন কোন মানসিক কাজ করে তখন এই অগণিত শক্তি কণার মধ্য হতে কতগুলো একত্রে জোট বেঁধে কাজটি সম্পন্ন করে।

কোন কোন শক্তি কণা কিভাবে একটি নির্দিষ্ট কাজ করতে জোট বাঁধে তা নির্ভর করে ঐ কাজটির প্রকৃতির উপর এবং শক্তি কণাগুলো অন্তর্নিহিত ক্ষমতার উপর। এজন্য থমসনের এই তত্ত্বকে স্যাম্পলিং থিয়োরি (Sampling Theory) বা বাছাই তত্ত্ব বলা হয়।

এই তত্ত্বটিতে বহু শক্তির অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয়েছে বলে বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী শর্নডাক একে মাল্টিফ্যাক্টর থিয়োরী বা বহুশক্তি তত্ত্ব বলে বর্ণনা করেছেন। থমসন ও শর্নডাকের তত্ত্ব দুটি মূলত এক এবং অভিন্ন।

(৩) গিলফোর্ডের বুদ্ধির সংগঠন তত্ত্ব : ১৯৭৯ সালে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গিলফোর্ড তার সহকর্মীদের নিয়ে বিভিন্ন ধরনের গবেষণা করে বুদ্ধির ৮০টি উপাদান সনাক্ত করেছে। তিনি বুদ্ধির তিনটি শ্রেণি বিভাগ করে তিনটি মাত্রার নির্দেশ করেছেন যথা-(১) প্রক্রিয়াগত মাত্রা (২) বিষয়বস্তুগত মাত্রা (৩) ফলাফলের মাত্রা।

১। প্রক্রিয়াগত মাত্রা : প্রাথমিক মানসিক প্রক্রিয়া সংক্রান্ত উপাদানগুলোই হল এই প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত যা হলো (ক) প্রজ্ঞা (খ) স্মৃতি (গ) কেন্দ্রাঙ্গচিন্তন (ঘ) অভিসারী চিন্তন (ঙ) মূল্যায়ন।

২। বিষয়বস্তুগত মাত্রা : বিষয়বস্তু সংক্রান্ত উপাদান অর্থাৎ বুদ্ধিমূলক কাজের বিষয়বস্তুর বিভিন্নতা হল বিষয়বস্তুগত মাত্রা। গিলফোর্ড এই মাত্রায় ৪ প্রকার ক্ষমতা অন্তর্ভুক্ত করেছেন। যথা-(ক) চিত্রগত (খ) সাংকেতিক বিষয়বস্তু (গ) বিমূর্ত ভাষামুক্ত বিষয়বস্তু (ঘ) বিচরমূলক বিষয়বস্তু।

৩। ফলাফলের মাত্রা : জ্ঞানের প্রকৃতি সংক্রান্ত উপাদান হল ফলাফলের মাত্রা। এবং এই ফলাফলের মাত্রা বুদ্ধির ক্রিয়ার ফলে ব্যক্তির কাজে জ্ঞাতব্য বিষয়বস্তু বিশেষ প্রকৃতিতে আসে। মানসিক ক্ষমতা ও বিষয়বস্তু সংক্রান্ত ক্ষমতার পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে হয় প্রকৃতির ফল পাওয়া যায়। যথা-(ক) এককের ধারণা (খ) শ্রেণিগত ধারণা (গ) সম্পর্ক সম্বন্ধ ধারণা (ঘ) সংগঠন সম্বন্ধে ধারণা (ঙ) পরিবর্তনশীলতা সংক্রান্ত ধারণা (চ) তাৎপর্য সংক্রান্ত ধারণা।

ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় অতীতে মনোবৈজ্ঞানিক অকৃতি বা মস্তিস্কের গঠন দেখে বুদ্ধির পরিমাপের চেষ্টা করা হতো। বিজ্ঞানসম্মত বুদ্ধি পরিমাপের প্রথম চেষ্টা করেন স্যার ফ্রানসিস গ্যালটন (গ্যালটনের নিজের বুদ্ধ্যঙ্ক ছিল ২০০)। তিনি প্রধ্বংস প্রতিক্রিয়ার গতি, প্রতিবেদনের তীক্ষ্ণতা, বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়ার পরিমাপের চেষ্টা করেন। এরপর ক্যাটেল সর্বপ্রথম বুদ্ধি 'অভীক্স' বা (Mental) শব্দের ব্যবহার করেন। বিজ্ঞানসম্মত বুদ্ধি অভিক্ষার উদ্ভাবক হিসেবে ফরাসী মনোবিজ্ঞানী আলফ্রেড বিনে নাম সর্বজন পরিচিত।

আলফ্রেড বিনে ১৯০৫ সালে প্রথম বুদ্ধি অভিক্ষা তৈরি করেন। ১৯০৮ সালে বিনে সিমো দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন। এই সংস্করণের বিষয়গুলো বয়স অনুপাতে সাজানো হয়। এ অভীক্ষায় এমন প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যা ঐ বয়সের শতকরা ৬০ থেকে ৭০ ভাগ শিশু সম্পাদন করতে সক্ষম হয়। এ প্রশ্নগুলোতে ছিল যুক্তি, পার্থক্য নির্ণয়, বোধগম্যতা, বিচার ক্ষমতা এবং অন্যান্য সহজ থেকে কঠিন এভাবে ক্রমান্বয়ে সাজিয়ে একটি স্কেল তৈরি করেন। বিনে-সিমো অভীক্ষার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, এই অভীক্ষাতে প্রথম মানসিক বয়সের উপযোগী প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম তাই হলো তার মানসিক বয়স এবং জন্মের পর হতে যে বয়স গণনা হয় তাকে বলা হয় প্রকৃত বয়স। মানসিক বয়স এবং প্রকৃত বয়সের অনুপাত হল বুদ্ধ্যঙ্ক।

বুদ্ধ্যঙ্ক (Intelligence Quotient) : বলা হয় ব্যক্তির মানসিক বয়স ও প্রকৃত বয়সের সম্বন্ধই হলো বুদ্ধ্যঙ্ক। অধ্যাপক এল.এম. টারম্যান (L.M. Terman) সর্বপ্রথম বুদ্ধি পরিমাপের গাণিতিক পদ্ধতিটির উদ্ভাবন করে বুদ্ধ্যঙ্ক (Intelligence Quotient) শব্দটির ব্যবহার করেন। বুদ্ধ্যঙ্ক হলো ব্যক্তির ব্যবহারের জন্যই বিশেষভাবে

উল্লিখিত। যে কোন ব্যক্তির মানসিক বয়স প্রকৃত বয়স দ্বারা ভাগ করে ভগ্নাংশ এড়ানোর জন্য তাকে ১০০ দ্বারা গুণ করে যে ফলাফল পাওয়া যায় তাই হল বুদ্ধ্যঙ্ক। বুদ্ধ্যঙ্ককে পরের এই সূত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়।

বুদ্ধ্যঙ্ক = Intelligence Quotient (I.Q.)

মানসিক বয়স = Mental Age (M.A)

প্রকৃত বয়স = Chronological Age (C.A)

সূত্র :

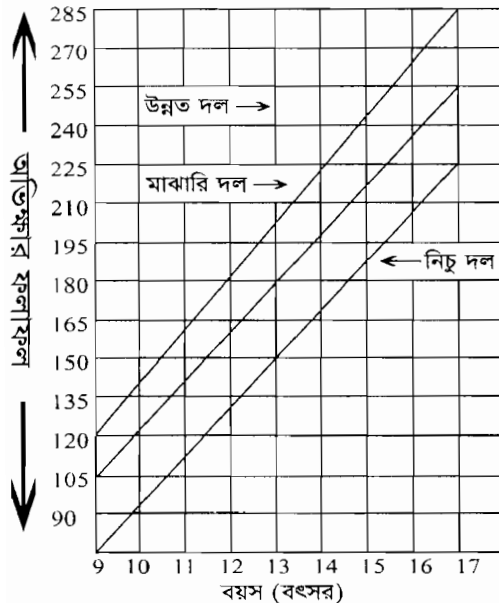
$$\text{বুদ্ধ্যঙ্ক} = \frac{\text{মানসিক বয়স}}{\text{প্রকৃত বয়স}} \times 100$$

$$\text{বা, I.Q.} = \frac{\text{M.A}}{\text{C.A}} \times 100$$

বুদ্ধির বিকাশ : মানুষের মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল তার বৌদ্ধিক বিকাশের দিক। বুদ্ধির বিকাশ বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন হারে হয়ে থাকে। বাল্যকালে মাঝামাঝি এবং কৈশোরে এর হার আরও কমে যায় আর প্রাপ্ত বয়সে খুবই কমে যায়।

তবে ফ্রিম্যান (F.N. Freeman) অনেক বছর ধরে পরীক্ষা করে দেখেছেন, যে ব্যক্তি দশ বৎসর বয়সে অপেক্ষাকৃত উচ্চ বুদ্ধিসম্পন্ন থাকে, ষোল বৎসর বয়সেও সে উন্নত বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে থাকে। আবার কম বয়সে যে স্বল্প বুদ্ধির পরিচয় দেয় সে সারা জীবন স্বল্প বুদ্ধির পরিচয় দেয়।

বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী বুদ্ধির বিকাশ সংক্রান্ত গবেষণায় দেখেছেন এর শেষ সীমা কত বয়সে হয়। টারম্যান বলেন ষোল বৎসর, আবার ভেঙ্কলার (Weehler) বলেছেন, যারা উন্নত বুদ্ধিসম্পন্ন তাদের ক্ষেত্রে বুদ্ধির বিকাশ কুড়ি বৎসর বয়স পর্যন্ত হয়ে থাকে। বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে দেখা গেছে বৌদ্ধিক বিকাশের বিভিন্ন দিকের বুদ্ধির তারতম্য লক্ষ্য করা যায় এবং কিছু কিছু বিকাশ, এমনকি প্রাপ্ত বয়সেও হয়।



বুদ্ধির উপর বংশগতির প্রভাব : বংশগতি জীবের উৎপত্তি, ক্রমবিবর্তন, জিন, ক্রোমোজোম উত্তরাধিকার বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি নিয়ে গবেষণা করে বংশগতি বিজ্ঞান জীবের উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জিত পিতামাতার শারীরিক বৈশিষ্ট্য ও মেধা, প্রবণতা নিয়ে গবেষণা করে থাকে এবং প্রমাণ করেছে জীবের বুদ্ধিমত্তা বিকাশে বংশগতির প্রভাব রয়েছে। মনোবিজ্ঞানীরা একই মত পোষণ করেন।

১। গ্যাল্টন (Galton) : তার যুক্তির সপক্ষে ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁর (Hereditary Genius) নামক বইয়ে ৯৭৭ জন বিখ্যাত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনের জীবন পর্যালোচনা করে লক্ষ্য করেন এদের মধ্যে ৫৩৬ জন আত্মীয়-স্বজন জীবনের কোন না কোন ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত অন্যদিকে খুব সাধারণ ৯৭৭ জন ব্যক্তির স্বজন সম্পর্কে অনুসন্ধান করে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন তাদের মধ্যে মাত্র ৪ জনের আত্মীয়রা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই গ্যাল্টন বংশগতির প্রভাবকে জীবনে প্রতিষ্ঠার মূলে আছে বলে সিদ্ধান্ত দেন।

২। টারম্যান ও মেরলি এই দুই মনোবিদ দীর্ঘদিন ধরে পিতামাতার পেশা এবং সন্তানদের বুদ্ধ্যঙ্ক পরিমাপ করে প্রমাণ করেছেন বুদ্ধিমত্তা বিকাশে বংশগতির প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না।

ক্রমিক নং	পিতামাতার পেশা	সন্তানের বুদ্ধির গড়মান
১।	উচ্চ পেশাজীবী ও স্বাধীন ব্যবসায়ী	১১১.৬২
২।	আধা পেশাজীবী	১১০.৯০
৩।	কেরানী	১০৭.৫০
৪।	দক্ষ-অদক্ষ শ্রমিক	৯৫.২০
৫।	গ্রাম্য কৃষিজীবী	৯৫.১০

দেখা গেল উচ্চ পেশাজীবীদের সন্তানদের বুদ্ধির গড় বেশি।

৩। মনেবিজ্ঞানী হ্যারলেন গবেষণায় একই ফল দেখা যায় -

ক্রমিক নং	পিতামাতার পেশা	সন্তানের বুদ্ধির গড়মান
১।	চাকুরীজীবী	- ১২৫
২।	ইঞ্জিনিয়ার	- ১২৫
৩।	শিক্ষক	- ১২১
৪।	পেইন্টার	- ৯৮
৫।	কৃষক	- ৯১

উচ্চ পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের সন্তানের অধিক বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন।

৪। মনোবিদ গ্যালটন ডারউইনসহ পৃথিবীর কয়েকটি বিখ্যাত পরিবারের ইতিহাস সংগ্রহ করে দেখেন তাদের মধ্যে প্রায় সকলেই উচ্চ মেধাসম্পন্ন। অন্যদিকে মনোবিদ ডাগডেল জুকেস কয়েকটি নিম্ন পরিবারের ইতিহাস সংগ্রহ করে দেখেন তাদের পরিবারের কেইই উচ্চ মেধাসম্পন্ন নয়।

উচ্চ মেধাসম্পন্ন হতে হলে যেমন বংশগতির আশীর্বাদ লাগে, তেমন লাগে ধৈর্য্য, প্রচেষ্টা এবং কঠিন সাধনা। মানুষের স্মৃতি, বিস্মৃতি, কল্পনা, চিত্র, মনোযোগ, প্রত্যক্ষণ, যুক্তি, সামাজিককরণ, আবেগ, অনুভূতি ও বুদ্ধি ইত্যাদির আলোচনার মাধ্যমে মানুষের জ্ঞান ও কৌশলের দক্ষতা বিকাশ হওয়া সম্ভব। বুদ্ধি হলো মানুষের একটি মানসিক সক্রিয়তার অংশ। বুদ্ধি প্রবণতায় দ্বারা ব্যক্তি তার জীবনের সকল ক্ষেত্রেই অভিযোজিত হয়ে থাকে। মনোবিদ স্টার্নের সঙ্গে মত মিলিয়ে বলব, "জীবনের নতুন সমস্যা বা পরিস্থিতির সঙ্গে অভিযোজন করার সাধারণ মানসিক ক্ষমতাই হল বুদ্ধি।"

মনোবিদদের সত্যমতের ভিত্তিতে

ড. আকন্দ সামসুন নাহার

৮/বি, লেকরিপেল

১১/ডি, নায়েম রোড

ঢাকা



## বাংলাদেশে অপুষ্টির কারণ ও প্রতিকার

বাংলাদেশের মোট জনসমষ্টির এক বিরাট অংশ দারিদ্র সীমার নিচে বাস করে। এই জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ অপুষ্টির শিকার। ফলে অপুষ্টিজনিত সমস্যা জাতীয় জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত। উন্নয়নের বর্তমান সূচকগুলোর মধ্যে পুষ্টি অন্যতম। তাই অন্যসকল ক্ষেত্রে পূর্ণতা অর্জন করতে পারলেও পুষ্টির অভাবের কারণেই আমরা অনুন্নয়নের গোলক ধাঁধায় ঘুরপাক খাব। দেশের এই ব্যাপক জনগোষ্ঠীর অপুষ্টির কারণে স্বাস্থ্য, শিক্ষাগ্রহণ ও উৎপাদন শক্তির উপর মারাত্মক বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হচ্ছে। অপুষ্টিজনিত সমস্যা শিশু ও মহিলাদের মধ্যেই অধিকতর প্রকট।

অপুষ্টির সূচনা : দীর্ঘস্থায়ী অপুষ্টির প্রভাব শুরু হয় কম ওজন নিয়ে শিশুর জন্মের মধ্য দিয়ে (আমাদের দেশে ৩০-৪০% নবজাত শিশু স্বাভাবিকের চেয়ে কম ওজন নিয়ে জন্মায়)। প্রাপ্ত বয়স্ক অবস্থায়ও এর রেশ চলতে থাকে। যার কারণে শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশ ব্যাহত হয়। প্রাথমিক ক্ষতিসাধন হয়ে থাকে গর্ভকালীন সময় থেকে আরম্ভ করে ২ বছর বয়সের মধ্যে। মেয়েদের মধ্যে এই সমস্যা বেশি দেখা যায়। এর ফলে কৈশোরে, গর্ভকালে এবং দুগ্ধদানকালে আরো জটিল রূপ ধারণ করে। আমাদের দেশের পঁচ বছরের কম বয়স্ক শিশু মৃত্যুর দুই-তৃতীয়াংশই ঘটে থাকে অপুষ্টির কারণে। প্রায় ৫০% মহিলা ও শিশু অপুষ্টিজনিত রক্তস্বল্পতায় ভুগে থাকে।

আমাদের দেশে যে ধরনের অপুষ্টি দেখা যায়, তা হলো :

১। শিশুদের আমিষ ও খাদ্যশক্তির অভাবজনিত অপুষ্টি (পি.ই.এম)।

২। মহিলাদের/মায়েদের দীর্ঘস্থায়ী অপুষ্টি, যেমন-কম ওজন, কম উচ্চতা, গর্ভধারণ ও দুগ্ধদানকালে রক্তস্বল্পতা।

৩। সব বয়সের মানুষের মধ্যে ভিটামিন-এ, আয়রন, আয়োডিন ইত্যাদি অণুপুষ্টির অভাবজনিত সমস্যা।

অপুষ্টির কারণগুলোকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায় :

১। পরিবার প্যায়ে অপরিপূর্ণ খাদ্য নিরাপত্তা;

২। স্বাস্থ্যসেবায় অপ্রতুলতা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং

৩। খাওয়া-দাওয়া, ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্য পরিচর্যা সংক্রান্ত যথাযথ আচরণ ও অভ্যাসের অভাব।

অপুষ্টির প্রভাব : অপুষ্টিজনিত সমস্যা জনস্বাস্থ্যের প্রতি হুমকিস্বরূপ। অপুষ্টিজনিত কারণে দৈহিক বৃদ্ধি, মানসিক বিকাশ, শিক্ষাগ্রহণ ক্ষমতা ও উৎপাদন ক্ষমতায় প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্টি করে। অপুষ্টি সমস্যার কারণে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে যদি এ সমস্যার মোকাবেলায় ত্বরিত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হয় তাহলে এটা প্রকট আকার ধারণ করবে। অপুষ্টিজনিত সমস্যা থেকে উত্তরণ না হলে এই সমস্যাই জাতীয় উন্নয়নের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। অপুষ্টি ও দারিদ্র পরস্পর দুষ্টিচক্রের ন্যায় ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। দারিদ্রতা খাদ্যের অভাবে ঘটে, যার ফলে অপুষ্টির সৃষ্টি হয়। অপুষ্টির কারণে রোগব্যাদীর প্রকোপ বৃদ্ধি পায়, চিকিৎসা ব্যয় বৃদ্ধি পায়, উপার্জন ক্ষমতা কমে যায়, ফলে দারিদ্রতা আরও প্রকট হয়। এভাবে অপুষ্টি ও দারিদ্রতা একটি পঙ্কিল চক্র সৃষ্টি করে। অপুষ্টি ও দারিদ্রতা একে অপরকে খারাপ অবস্থা থেকে অধিকতর খারাপ অবস্থায় নিয়ে যায়। সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্রতা দূরীকরণ অত্যন্ত সময়-সাপেক্ষ বিষয়। এ ধরনের উন্নয়ন ঘটিয়ে দারিদ্রতা দূরীকরণ ও এর ফলে অপুষ্টি হ্রাসের আশা করা আবাস্তব। দারিদ্রতা দূরীকরণের জন্য অপেক্ষা না করে যুগপৎভাবে অপুষ্টি হ্রাসের জন্য প্রত্যক্ষ ও ত্বরিত ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

অপুষ্টির প্রকারভেদ : (১) অপুষ্টি (Malnutrition) : দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় প্রয়োজনের তুলায় কোন খাদ্য উপাদান বেশি বা কোন খাদ্য উপাদান অনেক কম পরিমাণে থাকলে এবং সেই সাথে এই ধরনের খাবার



বহুদিন যাবত গ্রহণ করলে এই পুষ্টিহীনতা দেখা দেয়।

(২) আন্ডার নিউট্রিশন (Under nutrition) : এই অবস্থায় সব রকমের খাদ্য উপাদানের ঘাটতি দেখা যায়। অর্থাৎ আমিষ, শর্করা, তেল, খাদ্যপ্রাণ, খনিজ লবণ ইত্যাদি উপাদানের ঘাটতিজনিত পুষ্টিহীনতার লক্ষণ দেখা যায়।

(৩) স্থূলতা (Over nutrition) : প্রয়োজনের তুলনায় বেশি খাবার গ্রহণ। কম কায়িক পরিশ্রম এই অবস্থা সৃষ্টি করে। অতিপুষ্টি বর্তমানে হৃদরোগ, শ্বাসকষ্ট, কর্মক্ষমতা হ্রাসসহ মৃত্যুর ঝুঁকি বাড়ায়।

(৪) নির্দিষ্ট খাদ্য উপাদানের অভাবজনিত অপুষ্টি বা স্পেসিফিক ডেফিসিয়েন্সি (Specific deficiency) : এই ধরনের পুষ্টিহীনতায় বিশেষ কোন খাদ্য উপাদানের ঘাটতি থাকবে এবং তার অভাবজনিত রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাবে। যেমন-লৌহ খনিজ লবণের অভাবের জন্য রক্তস্বল্পতা দেখা দেয়। ভিটামিন 'এ' এর অভাবের জন্য রাতকানা রোগ (জেরপথ্যালমিয়া) দেখা দেয়। অয়োডিনের অভাবে গলগন্ড ও অন্যান্য সমস্যা দেখা দেয়।

অপুষ্টির লক্ষণ : প্রথম অবস্থায় নিম্নলিখিত লক্ষণসমূহ প্রকাশ পায় -

(১) শিশুর ঠিকমত শারীরিক বিকাশ ঘটে না

(২) খেলাধুলায় উৎসাহ কম থাকে

(৩) দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকার জন্য শিশুর ঘন ঘন বিভিন্ন রকমের রোগ দেখা দেয়।

অবস্থা মারাত্মক হলে নিম্নলিখিত উপসর্গগুলো দেখা দেয় :

- দেহের ওজন ক্রমশঃ কমে থাকে।
- মাংসপেশীর গঠন ঠিকমত হয় না অর্থাৎ মাংসপেশী দুর্বল হয়ে পড়ে।
- শরীরের চামড়ার নিচে চর্বি খুব কম ক্রম থাকে
- শিশু খাওয়া-দাওয়া এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি উদাসীন থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে শিশু অত্যাধিক কান্নাকাটি করে ও মেজাজ খিটখিটে থাকে

• মাথার চুলের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা এবং রঙের পরিবর্তন দেখা দেয়।

• ঘন ঘন ডায়রিয়া হয়, ফলে পানি শূন্যতা দেখা দেয়।

• হাতে পায়ে পানি জমে ইডিমা দেখা দিতে পারে

• শরীরের বিভিন্ন স্থানের চামড়ার স্বাভাবিক রঙের পরিবর্তন হতে পারে এবং চর্মরোগ দেখা দিতে পারে।

• রক্তস্বল্পতা, ভিটামিন 'এ' এবং অন্যান্য অপুষ্টির অভাবজনিত সমস্যা দেখা দিতে পারে।

• যকৃত (লিভার) এর আকার বাড়তে পারে

আমিষ শক্তির ঘাটতিজনিত অপুষ্টি : বাংলাদেশে আমিষ শক্তির ঘাটতিজনিত অপুষ্টি একটি অন্যতম প্রধান অপুষ্টি সমস্যা। শিশুরা এবং গর্ভবতী ও স্তন্যদাত্রী মা এই সমস্যায় বেশি ভুগে থাকে। এই পুষ্টিহীনতার জন্য আমাদের দেশে লক্ষ লক্ষ শিশু অকালে মারা যায় এবং বহু শিশু স্বাস্থ্য ও মেধাহীন হয়। ২০০৬ সালের (State of the World Children 2006) শিশুস্বাস্থ্য জরীপে দেখা যায়-অনুর্ধ্ব ৬ বছর বয়সী শতকরা ৪৩ ভাগ শিশু খর্বকায় এবং শতকরা ৪৮% ভাগ শিশু বয়স অনুযায়ী কম ওজন সমস্যায় ভুগছে। পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, বিগত সূময়ে প্রতিবছর শিশুর খর্বাকৃতির হার শতকরা ১.৮ ভাগ হারে কমছে এবং বয়স অনুযায়ী কম ওজন সমস্যার শতকরা ১.২ ভাগ হারে কমছে যা উৎসাহব্যঞ্জক।

লৌহ বা আয়রণের ঘাটতিজনিত রক্তস্বল্পতা : মহিলা ও শিশুদের মধ্যে আয়রণের ঘাটতিজনিত রক্তস্বল্পতার হার সবচেয়ে বেশি কারণ, তাদের শরীরে আয়রণের চাহিদা থাকে এবং প্রতিদিন যে পরিমাণ আয়রণ তাদের শরীরে দরকার সেই পরিমাণ তারা খায় না, অথবা খেলেও শরীরের রক্তে পর্যাপ্ত পরিমাণ পৌছায় না অথবা খাবারের যে উৎস থেকে সহজে আয়রণ শরীরের রক্তের সঙ্গে মিশে সেই সকল খাবার না খাওয়ার অথবা

ভিটামিন 'সি' যুক্ত খাবার কম খাওয়া দরুণ অথবা বক্রকুমিজনিট পেটের পীড়ার কারণে আয়রণের ঘাটতিজনিত রক্তস্বল্পতা হতে পারে। এছাড়া প্রতিমাসে মাসিক হওয়ার ফলে কিশোরী ও মহিলারা আয়রণের ঘাটতিজনিত রক্তস্বল্পতার শিকার হয়।

আয়োডিনের ঘাটতিজনিত সমস্যা : বাংলাদেশে অপুষ্টিজনিত সমস্যার মধ্যে আয়োডিনের অভাবজনিত রোগসমূহ অন্যতম। আয়োডিন ঘাটতির যে লক্ষণ সচরাচর আমাদের চোখে পড়ে তা হলো, গলগন্ড বা ঘ্যাগ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আয়োডিনের অভাবে বিভিন্ন ধরনের অসুস্থতা দেখা দেয়।

সুষ্ঠুভাবে শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশের জন্য আয়োডিনের দরকার। মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রের স্বাভাবিক বিকাশে এর প্রয়োজন আছে। প্রয়োজনীয় আয়োডিনের অভাবে শিশুর বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, মানসিক প্রতিবন্ধী ও বিকলাঙ্গ হয়, বোবা, কালা, ট্যারা হয়। আয়োডিনের অভাবে গর্ভপাত হয়। গবেষণায় দেখা গেছে আয়োডিনের অভাবে শিশুর আই.কিউ ১০ পয়েন্ট কমে যায়। অনেক সময় শিশু জন্মের আগেই মারা যায়। অনেক শিশু হাবা-গোবা ও নির্বোধ হয়ে থাকে। আয়োডিনের অভাবজনিত সমস্যার প্রভাব জ্ঞান থেকে শুরু করে শিশু, কিশোর-কিশোরী, প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে-মেয়ে সকলের মধ্যেই দেখা যায়।

বাংলাদেশে আইডিডি এর উপর ১৯৯৩ সালে পরিচালিত জাতীয় জরীপ ১৯৯৩ হতে দেখা যায় যে মোট জনসংখ্যার শতকরা ৪৭.১ ভাগ জনগনের মধ্যে গলগন্ডের লক্ষণ আছে এবং শতকরা ৬৮.৯ ভাগ আয়োডিনের অভাবে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় (Bio chemically deficient) ভুগছে। অপরদিকে ১৯৯৯ সালের জরীপ অনুযায়ী দেখা যায়, মোট জনসংখ্যার শতকরা ১৭ ভাগের মধ্যে গলগন্ডের লক্ষণ আছে এবং শতকরা ৪৩.১ ভাগ জনগণ আয়োডিনের অভাবে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানে আছে।

জন্মকালীন কম ওজন : একটি দেশে শিশুর কম জন্ম ওজনের হার একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য নির্দেশক। কম জন্ম-ওজনের শিশুর জন্মের প্রবণতার সাথে সেই দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির একটি সম্পর্ক আছে। জন্মকালীন কম ওজনের শিশু ঘনঘন সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয়। যাতে করে শিশুরোগ ও শিশু মৃত্যুর হার বেড়ে যায়। বিগত বছরগুলোতে দেখা গেছে বাংলাদেশে জন্মকালীন কম ওজনের শিশু জন্মের হারের পরিবর্তন হয়নি, ধারণা করা হয় বর্তমানে এই হার শতকরা ৩৫-৪০ ভাগ।

কোয়াশিয়রকর (Kwashiorkor) বা গা ফোলা রোগ : এই অবস্থা মারাত্মক অপুষ্টির ক্ষেত্রে দেখা যায়। আমিষ উপাদানের মারাত্মক ঘাটতি এবং ক্যালরি ও অন্যান্য পুষ্টি উপাদানের অনুপুষ্টিিক অভাবের দরুণ এই অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। ৯ মাস থেকে ৩ বছরের শিশুরা প্রধানত “কোয়াশিয়রকর” রোগে আক্রান্ত হয়।

কোয়াশিয়রকর বা গা ফোলা রোগের লক্ষণসমূহ :

- হাতে পায়ে পানি জমে।
- শিশুর ওজন কম হয়। তবে স্বাভাবিক ওজনের শতকরা ৬০-৮০ ভাগের মধ্যে থাকে।
- চুলের মসৃণতা নষ্ট হয়, পাতলা, খসখসে এবং ধূসর বা লালচে হয় এবং সহজে উঠে আসে।
- ত্বক পাতলা, মসৃণ হয়, চামড়ায় ঘা দেখা দিতে পারে।
- মনের প্রফুল্লতা কমে যায়।
- চামড়ার নিচে চর্বি কমে যায়।

এই সমস্ত লক্ষণের সাথে শিশুর দৈনন্দিন খাবারের ইতিহাস নিলে দেখা যাবে যে তার খাবারে আমিষ জাতীয় খাবারের মারাত্মক ঘাটতি রয়েছে।

শিশুর খাবারে প্রয়োজনীয় আমিষ এবং খাদ্যশক্তির অভাব থাকলে এই মারাত্মক পুষ্টিহীনতা দেখা দেয়। এই অবস্থায় শিশুর ওজন ধীরে ধীরে কমে যায় এবং সে রুগ্ন ও হাড়িসার হয়ে পড়ে। শিশুর বয়সের তুলনায় তার ওজন ৬০ ভাগ বা তার কম হলে এবং শরীরে পানি না জমলে তাকে ম্যারাসমাস বলে। ৬-১৮ বছর বয়সে এই রোগ বেশি হয়।

ম্যারাসমাস (Marasmus) বা হাড়িসার রোগের লক্ষণ :

- দেহের ওজন কমে যায় এবং বুদ্ধি ব্যাহত হয় ।
- মাংসপেশী শুকিয়ে হাড়িসার হয় ।
- মাংসপেশীর নিচের চর্বি শুকিয়ে যায় । ফলে চামড়া টিলা ও শুষ্ক হয় । গাল বসে যায় এবং বয়স্ক মানুষের চেহারা হয় ।

- বদমেজাজি হয় এবং অস্থিরতা থাকে ।
- শরীরের তাপমাত্রা কমে যেতে পারে ।
- রোগীর কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দেয় ।
- রক্তস্বল্পতা, রাতকানা ও অন্যান্য অণুপুষ্টির অভাবের উপসর্গ দেখা দেয় ।

অপুষ্টি প্রতিকারের উপায় :

অপুষ্টি প্রতিকারের উপায় নিম্নরূপ :

১. কম জন্ম-ওজন (LBW) শিশুর জন্ম প্রতিরোধ করা :

- শিশু জন্ম নিলে চেষ্টা করতে হবে সে যে স্বাভাবিকভাবে বাড়বে এবং তার যেন অপুষ্টি দেখা না দেয় ।
- কৈশোরে ও প্রাপ্ত বয়সে এবং গর্ভধারণের আগে সংশ্লিষ্ট মহিলা যেন সুস্থ ও স্বাভাবিক ওজনের অধিকারী হয় ।

• নববধূ যাদের ওজন কম এবং অপুষ্টিজনিত সমস্যা আছে, তাদের গর্ভধারণের আগে স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের অধিকারী অর্থাৎ বিএমআই ১৮.৫ বা তার অধিক হতে হবে ।

• গর্ভবতী মহিলাকে প্রতিবার খাবার সময় কিছুটা বাড়তি খাবার খেতে হবে । সকাল ও দুপুরের মাঝে একবার এবং দুপুর ও রাতের খাবারের মাঝে আরও একবার বাড়তি খাবার খেতে হবে । দিনে ৫ বার খাবার খাওয়া উত্তম ।

২. শিশুকে মায়ের দুধপান :

৬ মাস বয়স পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত শিশুকে শুধুমাত্র মায়ের দুধ খাওয়াতে হবে । সকল মা শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াতে সক্ষম ।	৬ মাস পূর্ণ হলে মায়ের দুধের পাশাপাশি ঘরে তৈরি বাড়তি খাবার দিতে হবে ।
---	--

৩. শিশুর বাড়তি খাবার : ৬ মাস পূর্ণ হলে মায়ের দুধের পাশাপাশি শিশুকে অল্প অল্প নরম, তারপর আধা শক্ত এবং পরে পরিবারের স্বাভাবিক খাবার খাওয়া শেখাতে হবে । ৭ মাস থেকে ৩ বার, ৯ মাস থেকে ৪ বার এবং ১ বছর থেকে শিশুকে ৫ বার বাড়তি পারিবারিক খাবার খাওয়াতে হবে ।

৪. নিরাপদ খাবার ও পানি : খাবার তৈরির আগে, মলত্যাগের পরে, শিশুর পায়খানা পরিষ্কার করার পরে সাবান বা ছাই দিয়ে ভালভাবে হাত ধুতে হবে । তাছাড়া খাবারে হাত দেয়ার আগে প্রতিবার সাবান বা ছাই দিয়ে হাত ধুতে হবে । খেয়াল রাখতে হবে যেন খাবার ও পানি নিরাপদ হয় ।

৫. মাসে মাসে শিশুর ওজন নেয়া এবং শিশুর বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ করা : সুস্থ শিশুর ওজন মাসে মাসে বাড়বে । ওজন না বাড়লে শিশুকে বাড়তি খাবার খাওয়াতে হবে । পরপর ২ মাস ওজন না বাড়লে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে ।

৬. ডায়রিয়া বা অন্য অসুখে করণীয় : ডায়রিয়া হলে যে পরিমাণ পানি শরীর থেকে বের হয় সে পরিমাণ খাবার স্যালাইন অল্প অল্প করে বার বার খাওয়াতে হবে । ডায়রিয়া বা পেটের অসুখে স্বাভাবিক পারিবারিক খাবারও খাওয়াতে হবে । পেটের অসুখের জন্য যদি শিশু দুর্বল হয়ে যায়, তাহলে স্বাভাবিক খাবারের সাথে ১-২ বার বাড়তি খাবার দিতে হবে ।

৭. টিকা দিয়ে রোগ প্রতিরোধ : ৭টি মারাত্মক রোগ টিকা দিয়ে প্রতিরোধ করা যায়। এর মধ্যে হাম একটি মারাত্মক রোগ। হাম হলে ডায়রিয়া ও নিউমোনিয়া দেখা দেয় এবং শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। ফলশ্রুতিতে অপুষ্টি দেখা দেয়। তেমনি ছপিং কাশি হলে শিশু প্রায় ৩ মাস অসুখে ভুগতে থাকে। ফলে অপুষ্টির শিকার হয়।

৮. মায়ের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ : মেয়েদের শিক্ষার দিকে নজর দিতে হবে। শিশুর পরিচয় সম্পর্কে মাকে সচেতন করা সম্ভব হলে অপুষ্টি প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে।

৯. পুষ্টি শিক্ষা : পুষ্টি শিক্ষার মাধ্যমে বিশেষ করে মেয়েদের, মায়ের এবং সমাজের সচেতনতা বৃদ্ধি করা সম্ভব হলে।

১০. খাদ্য গ্রহণ ও কুসংস্কার : চাহিদা অনুযায়ী পরিবারে খাবারের সুষম বন্টন হওয়া দরকার। যেমন-শিশু, কিশোর-কিশোরী, গর্ভবতী মহিলা, দুগ্ধদানকারী মায়ের বাড়াতি সুষম খাবার সম্বন্ধে সমাজে ধারণা তৈরি করা সম্ভব হলে অপুষ্টি প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে।

- বিভিন্ন অসুখে খাবার বর্জনের মত কুসংস্কারগুলো দূর করতে হবে। সাধারণতঃ অসুখের জন্য কিছু বাড়তি খাবার খেতে হয়। অসুখে সবধরনের পারিবারিক খাবার খাওয়া যাবে।

- শাক সব্জি ও ফল-মূল প্রতিদিন খেলে অপুষ্টির অভাব প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে।

স্বাক্ষর : আব্দুল মানিক

ম্যানেজার

সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন বোর্ড

সমাজসেবা অধিদপ্তর, বারপুর

বগুড়া

## প্রকৃতির পরিচ্ছন্নতাকর্মী ‘শকুন’ বাঁচিয়ে রাখুন

সমস্ত পৃথিবীতে মোট ২৩ প্রজাতির শকুন রয়েছে। বাংলাদেশে মোট পাঁচ প্রজাতির শকুন রয়েছে বলে রেকর্ড থাকলেও আমরা বাংলা শকুনই White backed vulture (Gyps bengalensis) দেখে থাকি। অন্যান্য প্রজাতিগুলো সংখ্যায় খুবই কম ছিল। এখনতো প্রায় নেই বললেই চলে। এর মধ্যে রাজশকুন King vulture (Sarcogyps calvus) যে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ লেখায় প্রধানত বাংলা শকুন নিয়েই আলোচনা করব। ৯০ এর দশক পর্যন্ত এ শকুন বাংলাদেশের সর্বত্রই ছিল। কিন্তু এর পরই মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই নানান কারণে এ শকুন অদৃশ্য হয়ে গেল। কারণগুলোর মধ্যে প্রধান একটি হল যে, গৃহপালিত গরুর ব্যথানাশক ওষুধ Diclofenac পর ব্যবহার। এছাড়া শকুনের আবাস ধ্বংসকরণ তথা বড় ও বুড়ো গাছ নির্বিচারে কাটাও আর একটি প্রধান কারণ। এরা বড় বড় উঁচু গাছ ছাড়া বাসা বাঁধেনা, এমন কি বিশ্রামও করে না। এভাবেই নিম্নগামী হল এদের সংখ্যা। এখন দেখা গেছে এদের ৯০%-ই হারিয়ে গেছে, যা আছে তা হুমকির সম্মুখীন। শুধু বাংলাদেশে নয় দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া জুড়েই এদের প্রায় ৯৯%-ই হারিয়ে গেছে, বিশেষ করে ১৯৯২ থেকে ২০০৭ এর মধ্যে। অথচ এসব এলাকায় ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত এ শকুনের ছিল প্রাচুর্য।

বাংলা শকুন ওজনে ৩.৫ থেকে ৪ প্রায় কেজি পর্যন্ত এবং লম্বায় ৭৫-৯৫ সেমি. হয়ে থাকে। এদের মাথায় কোন পালক থাকেনা। পাখা কেশরও প্রায় মিটার, কিন্তু লেজ খাট। সাদাকালো কিছু রূপালী-ছাইয়া গায়ের রং। মাথার রং কিছুটা গোলাপী, চোখ রূপালী।

শকুনের জন্য ২০-৩০ মিটার লম্বা গাছের প্রয়োজন। এসব গাছের অভাবে আমরা এমনও দেখেছি সুন্দরবনে মাত্র ৫ মিটার উঁচু গাছে এরা বাসা বেঁধেছে। যেসব গাছ বাসা ও বিশ্রামের জন্য এরা বেছে নেয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল দেবদারু, বট, কড়ুই, পাকুর, শিমুল, তেতুল, অর্জুন, পিপুল, নিম প্রভৃতি। কখনও কখনও প্রায় একশত বাসা দেখা যেত কোন এক বড় গাছে। এরা বেশীরভাগই মনুষ্য বসতির কাছাকাছি বড় বড় গাছ পছন্দ করতো যা এখন আর নেই। যেসব গাছে দলবেঁধে বিশ্রাম করত সেসব গাছ এদের বিষ্টায় প্রায় সাদা হয়ে যেত।

বাংলা শকুন আমাদের দেশের স্থায়ী বাসিন্দা। এরা দলবেঁধে অবস্থান করে। এরা মরা-পঁচা প্রাণি খেয়ে থাকে যা তারা আকাশে উড়ন্ত অবস্থায় দেখতে পায় এবং দলে দলে নেমে পড়ে। এরা স্বাস্থ্যবান সুস্থ প্রাণির কোনই ক্ষতি করেনা। বাংলা শকুনের বিস্তৃতি পৃথিবী জুড়ে শুধুমাত্র অস্ট্রেলিয়া এবং এন্টার্কটিকা ব্যতীত। এদের অস্তিত্ব বাংলাদেশসহ ভারত, নেপাল, ভুটান, মায়ানমার, পাকিস্তান, থাইল্যান্ড, লাওস, কম্বোডিয়া এবং দক্ষিণ ভিয়েতনাম জুড়ে আছে বলে রেকর্ড রয়েছে।

এরা সূর্যোদয় পর্যন্ত কোন প্রকার নড়াচড়া করে না। পরিবেশ কিছুটা গরম হলেই তবে আকাশে উড়তে সুবিধা বোধ করে। উঁচুতে উড়তে উড়তে যখনই কোন মৃত প্রাণি অবলোকন করে তখন দলে দলে বাঁপিয়ে পড়ে তার ওপর এবং ভুবুঙ্কের মত খেতে থাকে। দেখা গেছে একটি বড় সাইজের গরু বা মহিষ সাবাড় করতে এদের বিশ মিনিটের বেশী সময় লাগেনা। এরা এমনকি হাড়ের টুকরাও গিলে ফেলে। পূর্বে যখন রাজ শকুনের বিলুপ্তি ঘটেনি তখন প্রায়শঃই দেখা গেছে যে প্রথমে ২/১টি রাজ শকুন এসে মৃত প্রাণিটির পেটের দিকের চামড়া ছিড়ে খেতে শুরু করেছে। তারপর বাংলা শকুন খাওয়া শুরু করেছে যেন মুরকবী বিছিমিলাহ করেছে এবং এ জন্যই বাংলা শকুনের অপেক্ষা। আসলে সদ্যমৃত প্রাণির চামড়া ছেড়ার জন্য বাংলা শকুনের চেয়ে রাজশকুন বেশি শক্তিশালী।

বাংলা শকুনের বাসা তৈরির সময় কাল নভেম্বর থেকে জানুয়ারি। এদের বাসা অনেকগুলো একসাথে একই গাছে বা পাশাপাশি গাছে দেখা গেছে। তবে কোন কোন নব্য জোড়া আলাদাও বাসা করেছে বলে লক্ষ্য করা গেছে। বাসার আয়তন তিনফুটের মত এবং গভীরতা প্রায় এক ফুট রেকর্ড করা হয়। এরা ডিম পাড়ার আগ



সময় কিছু সবুজপাতা দিয়ে বাসায় বিছানার মত তৈরি করে। প্রতিবছর মাত্র একটিই ডিম পেড়ে থাকে এবং কোন কারণে ডিমটি কেউ নষ্ট করলে বা চুরি করলে অথবা ঝড়ে ক্ষতি হলে কিংবা কোন শিকারী প্রাণি খেয়ে ফেললে সে বছর প্রজনন সাফল্য শূন্য। কখনও কখনও এমনও দেখা গেছে যে, যদি বাসার ডিম ধরা হয় তাহলে মা পাখি রাগে হিশ হিশ গর্জন করতে থাকে এবং বেশী বিরক্ত করলে সে তার ডিম ও বাসা নিজেই ভেঙ্গে ফেলে দেয়। যদিও স্বভাবগতভাবে এরা বেশ নিরীহ পাখি। ডিমে তা দেয়ার সময়কাল ৪২-৪৫ দিন। আমাদের এক গবেষণায় দেখা গেছে ইনকিউবেটরে ৪৪ দিনে ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়েছে। ৬৫-৮০ দিনে ছানা উড়তে সক্ষম। আমাদের ল্যাবরেটরীতে ছোট ছানা ১২২ দিন লালিত পালিত হয়, যেটি উড়তে সক্ষম। তবে দুর্ভাগ্য যে এ সময় এটি অজানা কারণে মারা যায়। যাই হোক শকুন কোন খাদ্য তার শিশুদের জন্য ঠোঁটে করে বয়ে আনেনা, বরং নিজে গলাধকরণ করে Crop এ করে নিয়ে আসে এবং উগড়ে উগড়ে শিশুকে খাওয়ায়। শকুন প্রায় ৫০ বছর বাঁচে বলে জানা যায়।

২০০৭ সাল নাগাদ শকুনের সংখ্যা ৯৯% নেমে আসে এ কথা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। জিম্বাবুয়েতে Gonarezhon ন্যাশনাল পার্কেই একসঙ্গে ১৮৩ টি শকুন বিষ দিয়ে (poisoning) মেরে ফেলে দেয়া হয়। Diclofenac বিষের প্রক্রিয়া বাংলাদেশসহ ভারত ও পাকিস্তান তথা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রায় ৯৫% বিভিন্ন প্রজাতির শকুনের অবলুপ্তি ঘটে। নেপালে গত ১০-১৫ বছরের মধ্যে উরপষড়ভবহধপ ঢড়রংড়হরহম এ শকুন প্রায় বিলুপ্ত।

শকুনের প্রাচুর্যের অভাবে স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দিয়েছে প্রকটভাবে। কেননা এখন মৃত প্রাণি পঁচেগলে দুর্গন্ধ সৃষ্টি করছেনা শুধু বরং এসব পঁচাগলা মৃতদেহ ইঁদুর, কুকুর, শেয়াল, খাটাস প্রভৃতি প্রাণি খেয়ে Rabis ছড়াচ্ছে। ভারত পৃথিবীর সব চেয়ে বড় উদাহরণ র‍্যাবিস এর। এ ছাড়া কোন কোন সম্প্রদায়ের জন্য এটি একটি মারাত্মক সমস্যা। পারসিদের রীতি মানুষের মৃত দেহ কোন এক উঁচু টাওয়ারে রেখে দেয়া যাতে শকুন খুব অল্প সময়ের মধ্যে খেয়ে শেষে করে এবং পরিবেশ নিষ্কলুষ রাখে। এদের রীতি ঠিকই আছে, কিন্তু শকুনের অভাবে পরিবেশ কলুষিত হচ্ছে।

ভারত সরকার Diclofenac এর ব্যবহার বন্ধ করেছে, বন্ধ করা হয়েছে আমাদের দেশেও আইনত। কিন্তু বস্ত্ততপক্ষে এর ব্যবহার এসব দেশে অদ্যাবধি চলছে।

যাহোক চেষ্টা চরিত্তি চলছে Captive breeding এবং Reintroduction এর। নেপালে Vulture Restrureal নামে এক প্রজেক্ট হাতে নেয়া হয়েছে যেখানে কোন কোন মনুষ্য বসতিবিহীন খোলা জায়গায় অসুস্থ ও বুড়ো প্রায় মৃত গবাদি পশু রাখা হয় শকুনের খাদ্য হিসেবে যাতে শকুনের বংশ বৃদ্ধি পায়।

শকুন সংরক্ষণের প্রচেষ্টা আমাদের জন্যও জরুরী অনতিবিলম্বে ব্যবস্থা নিতে হবে। যেমন-(১) এদের মারা, ডিম নষ্ট করা, বিরক্ত করা থেকে বিরত থাকা। (২) Diclofenac এর ব্যবহার বন্ধকরণ যা কঠিন শাস্তি ও বড় রকমের জরিমানার মাধ্যমেই সম্ভব। (৩) মৃতপ্রাণি মাটিতে পুঁতে না ফেলা বরং খোলা নিরিবিলি স্থানে ফেলে রাখা (৪) দেশীয় ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছের বনায়ন এবং তা পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে। (৫) বড় বুড়ো গাছ রক্ষণ, সর্বোপরি জনগণকে শকুনের গুরুত্ব বোঝানো অর্থাৎ জন সচেতনতা তৈরি করা যা রেডিও, টেলিভিশন, পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে সম্ভব। রামায়নে শকুনকে প্রকৃতির পরিচ্ছন্নতাকর্মী হিসেবে সম্মান করা হয়। চলুন আমরাও শকুনকে প্রকৃতির পরিচ্ছন্নকর্মী হিসেবে সম্মান করতে শিখি এবং শকুন সংরক্ষণে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করি। শকুন না থাকলে প্রকৃতির ভারসাম্য বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী।

ড. নূরজাহান সরকার  
প্রফেসর  
প্রাণিবিজ্ঞান বিভাগ  
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

## বাংলাদেশের আধুনিক ধান

বাংলাদেশে ধান গবেষণার যাত্রা শুরু হয় ব্রিটিশ ভারতের আমলে ঢাকাতে ১৯১০ সনে। দেশী জাতের ধান সংগ্রহ এবং এদের নিয়ে নানা রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে করতে ধান সম্পর্কে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য জানা হয়ে যায় বিজ্ঞানীদের। এরপর শুরু হয় মিশ্রিত দেশী জাতের ধান থেকে উত্তম বিশুদ্ধ লাইনগুলোকে আলাদা করার কাজ। এভাবে তৈরি করা হয়েছে সমরূপ এবং কিছুটা অধিক ফলনশীল জাত। এদের তখন বলা হতো স্থানীয় উন্নত জাত। আউশ, আমন আর বোরো এই তিন মৌসুমেরই স্থানীয় উন্নত জাত উদ্ভাবন করা হলো এবং এদের সম্প্রসারণও করা হলো। তাতেও আমাদের চাহিদা মফিক উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব হয়নি। অতঃপর শুরু হলো পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে ধানের জাত প্রবর্তনের কাজ। ধান জাতের মেধাস্বত্ব নিয়ে তখনও কোন প্রশ্নে উঠেনি বলে জাত প্রবর্তনে তেমন কোন সমস্যাই হলো না। কোন কোন প্রবর্তিত ধান জাত যেমন-নাইজার শাইল, পাজাম, পূর্বচী ইত্যাদি বেশ নামও করলো। সংকরায়নও শুরু হলো দেশী ধান জাতের মধ্যে। কখনো বা দেশী জাতের ধানের সাথে প্রবর্তিত কোন কোন জাতের সংকরায়নও সম্পন্ন করা হলো। ফলাফল তত উৎসাহব্যাঞ্জক ছিল না বটে তবে ফলন কিছুটা বেড়েছিল। সব ধান জাতেরই উচ্চতা ছিল অধিক, পাতাগুলোর ছিল হেলে পড়া স্বভাব, লম্বা বলে ধান গাছের কাণ্ড ছিল নরম, পুষ্টির একটু বাড় বাড়তি হলেই চলে পড়ত মাটিতে। সে কারণে ফলনও যেত অনেক কমে।

গাছের উচ্চতাকে কমিয়ে সালোক সংশ্লেষণটাকে বাড়ানোর কোন কৌশল তখনও বিজ্ঞানীদের অজানা ছিল। বলা চলে সেরকম যুৎসই খর্বাকৃতির কোন ধানের ইন্ডিকা জাত তখনও বিজ্ঞানীদের নজরে আসেনি। আর আমাদের দেশে ধান নিয়ে গত শতাব্দীর ষাট দশক পর্যন্ত যত গবেষণা চলেছে তার মধ্যে ধান গাছের উদ্ভিবাকৃতি নিয়ে গবেষণা কার্যক্রম চালাবার ভাবনাটি খুব একটা প্রাধান্যও পায়নি। বিভিন্ন পুস্তকে বা প্রতিবেদনে ধান উন্নয়নের উদ্দেশ্যসমূহ অবলোকন করলে সে কথা স্পষ্ট হয়ে উঠে। ফলে সনাতন উদ্ভিদাকৃতি নিয়েই গবেষণা চালাতে হয়েছে পঞ্চ দশক। কিছুটা সাফল্য এলেও মানুষ বাড়ছিল বলে আমদানী নির্ভরতা কিছুতেই কমছিল না।

বাংলাদেশ যখন স্বাধীনতা লাভ করে তখন এদেশের জনসংখ্যা ছিল সাড়ে সাত কোটি। ১৯৭০ সনে এ দেশের ধানের উৎপাদন ছিল ১১ মিলিয়ন মেট্রিক টনের কাছাকাছি। সে সময় প্রতি বছর গড়পড়তা ২০ লাখ টন খাদ্য শস্য বাইরে থেকে আমাদের আমদানী করতে হতো। সে সময় সেটিই সরকারের উপর বেশ একটা বাড়তি চাপ হিসেবে কাজ করতো। খাদ্য নিরাপত্তা বিধানের ক্ষেত্রে এটি এক ধরনের হুমকির মতোই ছিল। স্বাধীনতার পর ধান গবেষণার ক্ষেত্রে আমাদের দেশে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধিত হয়। এসময় আমাদের দেশের বিজ্ঞানীদের হাতে এসে পৌছে ইরি উদ্ভাবিত খর্বাকৃতির বিস্ময়কর এক একটি লাইন। তার সাথে যুক্ত হয় আমাদের দেশের বিজ্ঞানীদের মেধা। এই দুই মিলে এদেশে তৈরি হয় এক একটি সফল ধানের জাত। স্বাধীনতার প্রথম চার দশকে এদেশের ধান চাষের আবাদী এলাকা বেশ স্থিতিশীল থাকলেও ধানের ফলন দ্বিগুণেরও বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১০ সনে এসে এদেশের মোট চালের উৎপাদন দাঁড়িয়েছে ৩১.৯৬ মিলিয়ন টনে। বাংলাদেশে ধানের হেক্টর প্রতি ফলন ১.১ টন থেকে বেড়ে এই চল্লিশ বছরে দাঁড়িয়েছে ২.৬ টনে। আর হেক্টর প্রতি আধুনিক ধানের গড় ফলন এখন ৪.৩২ টন। ধানের এই অভাবনীয় ফলন বৃদ্ধির কারণ তিনটি। এক, নতুন উদ্ভাবিত জাতগুলোর ফলন বেশী হওয়ায় এসব জাত দিয়ে স্থানীয় জাতের ধান প্রতিস্থাপিত হয়েছে। দুই, উফশী জাত আবাদের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ যেমন-সার, সেচ ও বালাইনাশকের ব্যবহার যথাসম্ভব নিশ্চিত করা হয়েছে এবং তিন, বোরো মৌসুমে সেচের সুবিধা বৃদ্ধি পাওয়ায় উফশী বোরো ধানের আবাদ বৃদ্ধি পেয়েছে। চল্লিশ বছরের ধান গবেষণার এই পথ পরিক্রমায় আমরা পেয়েছি ব্রি উদ্ভাবিত ৫৭টি, বিনা উদ্ভাবিত ৭টি এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক উদ্ভাবিত ২টি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১টি ধানের জাত সহ মোট ৬৭টি আধুনিক ইন্ব্রেড ধান জাত। আউশ, আমন এবং বোরো তিন মৌসুম উপযোগী

জাতই উদ্ভাবন করেছেন বিজ্ঞানীরা। এর মধ্যে রয়েছে ৫টি এরোম্যাটিক ধানের জাতও। খরা, বন্যা, জোয়ার-ভাটা, লবণাক্ততা এমনি সব বৈরি পরিবেশ উপযোগী ধান জাতও উদ্ভাবন করা হয়েছে। উচ্চ ফলনশীল ধান জাতগুলোতে কত রকম ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য সংযোজন করে তৈরি করা হয়েছে এক একটি আধুনিক জাত। রোগ বালাই সহনশীলতা, স্বল্প জীবনকাল, খরা-লবণাক্ততা ও জলমগ্নতা সহিষ্ণু ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য অর্জন করে আমাদের উফশী ধান আধুনিক ধানে রূপান্তরিত হয়েছে।

১৯৬০ সনে প্রতিষ্ঠিত হবার ৫-৬ বছরের মাথায় ইরি বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় ধান গবেষণায় এক যুগান্তকারী সাফল্য অর্জিত হলো। মিরাকেল ধান বলে খ্যাত আই আর ৮ উদ্ভাবিত হলো। ১৯৬৬ সনে এর বীজ চলে এলো আমাদের দেশে। এর পর প্রতিবছর আসতে থাকলো ইরি উদ্ভাবিত নানা রকম পুরোগামী লাইন। লম্বা ধানের বদলে খাটো প্রকৃতির এক ধান। মানুষের মুখে মুখে এদের নাম হয়ে গেলো ইরি ধান। এদের ফলনশীলতা কৃষকের মনে এতটাই রেখাপাত করলো যে, ইরি ধানের নাম হয়ে গেলে তার মুখে মুখে আজও। এমনকি আমাদের শিতি সাংবাদিক ভাই বোনেরাও ব্রি ধানগুলোকেও এখন ইরি ধান বলেই চালিয়ে যাচ্ছেন। তো সেই ইরি ধান পাল্টে দিল আমাদের ধান গবেষণাটাকেই। পৃথিবীর আর অন্যান্য ধান উৎপাদনকারী দেশের মতো ইরি ধানের খর্বাকৃতির জিনকে কাজে লাগিয়ে উদ্ভাবন করা হলো তিন মৌসুমের জন্যই উচ্চ ফলনশীল ধানের জাত।

ইরি উদ্ভাবিত ধান জাতগুলো যেমন : আই আর-৮, আই আর-২০ ছিল খর্বাকৃতির, এমনকি বাংলাদেশে অবমুক্ত ধান জাত বি আর-১ এবং বি আর-৩ খর্বাকৃতির জাতই। বেশী খর্বাকৃতি হওয়ায় বাংলাদেশের ভিন্ন রকম কৃষি-প্রতিবেশিক অঞ্চলে এসব জাতের অভিযোজন মতা এক রকম ছিল না ফলে ব্রি বিজ্ঞানীরা উফশী ধানের ফলনশীলতা ধরে রেখে ধান গাছের ইডিওটাইপে কিছুটা পরিবর্তন নিয়ে এলেন। এবার খর্বাকৃতির নয় বরং আধা খর্বাকৃতির ধান জাত উদ্ভাবন করা হলো যাকে মাঝারি অকৃতির ধান জাতও বলা যায়। এসব জাতের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল দ্রুত বর্ধনশীল ধান চারা উৎপাদন মতা। পরিবেশের ভিন্নতার কারণে নানা পরিবেশ উপযোগী ধান জাত সৃষ্টি করতে হয়েছে বিজ্ঞানীদের। ব্রি উদ্ভাবিত ৫৭টি জাতের মধ্যে আউশ এবং বোরো দুই মৌসুমে আবাদ করা যায় তেমন জাতের সংখ্যা ১০টি। আর আউশ, আমন ও বোরো অর্থাৎ ৩ মৌসুম উপযোগী জাত হলো ১টি, বি আর-৩। সে কারণেই বোধ করি এর জনপ্রিয় নাম দেওয়া হয়েছে বিপ্রব। ব্রি উদ্ভাবিত বোরো ধানের সংখ্যা ৯টি আর শুধু আমন ও শুধু আউশ মৌসুমের ধান জাত যথাক্রমে ২৬টি ও ৮টি। ব্রি হাইব্রিড ধানের ৩টি বোরো মৌসুমের হাইব্রিড জাত আর বাকীটি আমন মৌসুমের জাত।

এসব জাতের অনেকগুলোই আসলে অনুকূল বা উপযুক্ত পরিবেশ উপযোগী জাত। উত্তম বীজ আর উত্তম পরিচর্যা পেলে এরকম পরিবেশে এরা অধিক ফলন প্রদান করে থাকে। ফসলের মাঠ যে এক রকম নয় সেটি বিজ্ঞানীদেরও অজানা নয়। নানারকম প্রতিকূল পরিবেশেও ফলাতে হয় ধান। প্রতিদিন দুবার জোয়ার ভাটা আসে যে কৃষি জমিতে তার জন্য প্রয়োজন হয় ভিন্ন রকম জাত। কিংবা যে মাটিতে লবণাক্ততার ভাগ বেশি তার জন্য প্রয়োজন হয় লবণাক্ত সহিষ্ণু জাত। নানা মাত্রার জলমগ্নতা বিরাজ করে কোন কোন ধানের ক্ষেতে। কখনও ঠাই দাঁড়িয়ে থাকে পানি তো কখনও আবার আকস্মাৎ পানির বাড় বাড়তি লক্ষ্য করা যায়। এসব সইয়ে নেবার ক্ষমতাসম্পন্ন জাতও কৃষকের প্রয়োজন। অধিক উষ্ণতা বা অধিক শীতও সমস্যা তৈরি করে ধান ফলাতে। অধিক উষ্ণতা সইয়ে নেবার ক্ষমতাসম্পন্ন জাত তৈরির চাহিদাও তাই কৃষকের রয়েছে। অধিক শৈত্য যেন ফসলের তেমন ক্ষতি না করে সে চাহিদাও যে নেই তা নয়। আবার পানির ঘাটতি বলে পানির অভাব সইতে পারে খরা এলাকার জন্য সে রকম জাত সৃষ্টির তাগিদতো রয়েছেই। ফলে নানা রকম বৈরি পরিবেশ উপযোগী জাত সৃষ্টির বিষয়গুলোকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হয় বিজ্ঞানীদের। সব কিছুকে মাথায় নিয়েই চলে নানা রকম জাত উদ্ভাবনের কর্মকাণ্ড।

অনেক রকম রোপা আমন জাত উদ্ভাবিত হয়েছে ব্রি থেকে। এমনকি বাদ যায়নি সুগন্ধি চালের জাত উদ্ভাবনও। অনেক দিনের বিরতি দিয়ে সুগন্ধি ধানের জাত উদ্ভাবন এ কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আমাদের রুচির প্রতিও একেবারে উদাসিন নন বিজ্ঞানীরা। বিলম্বে হলেও মানুষের চাহিদার প্রশ্নটিকে একেবারে উপেক্ষা



করেননি তারা। সুগন্ধী পোলাও বা বিরিয়ানী চালের জাত হলো ৪টি : বি আর-৫, বি ধান-৩৪, ৩৭ ও ৩৮। ১৯৭৬ সনে প্রথম অবমুক্ত করা হয় বাংলাদেশে আধুনিক কালে বাছাই করা সুগন্ধি চালের জাত বি আর-৫। অনেকটা হেলা ফেলায় চলে সুগন্ধি চালের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড : সে কারণেই বোধ করি ২১ বছর পর অবমুক্ত করা হয় বাকী ৩টি জাত। জাতগুলো আলোক সংবেদনশীল। সম্পূরক চাষের ব্যবস্থা করতে পারলে এসব জাত হেক্টর প্রতি ৪.০-৪.৫ টন পর্যন্ত ফলন দিতে পারে। অধিক ফলনশীল মাঝারি মোটা থেকে মোটা চালের রোপা আমন জাতগুলো হলো বি আর-১০, ১১ এবং বি ধান-৩০, ৩১। এ জাতগুলো স্বল্প আলোক সংবেদনশীল এবং সবচেয়ে বেশী ফলনশীল। এদের হেক্টর প্রতি ফলন ৫.০-৬.০ টন। বি-এর আগাম রোপা আমন জাতগুলো হলো বি আর ২৫, বি ধান ৩২, ৩৩, ৩৯ ও ৪৯। এ জাতগুলোতে আলোক সংবেদনশীলতা নেই। আলোক সংবেদনশীলতা না থাকায় কখন কৃষক ফসল কাটতে চান সে অনুযায়ী এদের মাঠে রোপন করা যায়।

রোপা আমনের একটি বিখ্যাত জাত হলো বি আর-১১। আমন মৌসুমের একটি অত্যন্ত সফল জাত এটি। এখন যদিও রোগ বাতাইয়ের আক্রমণে এই জাতটি তার আগের সম্মান ধরে রাখতে প্রায়শই ব্যর্থ হচ্ছে তবু এদেশের কৃষকের কাছে এই আমনের জাতটি বড় প্রিয়। বি আর-১১ জাতটি উদ্ভাবন করা হয়েছে ১৯৮০ সনে ইরি থেকে প্রাপ্ত দু'টি লাইনের মধ্যে ক্রস করে। এর জনপ্রিয় নাম হলো মুক্তা। এই জাতটির জীবন কাল ১৪৫ দিন। চাল মাঝারি মোটা আর ফলন গড়ে হেক্টর প্রতি ৫.৫ টন।

জলমগ্নতা আমাদের দেশের একটি বড় সমস্যা। প্রায়শই আকস্মিক বন্যায় আমন মৌসুমে নিচু এলাকাগুলোতে ধান গাছ জলমগ্ন হয়ে যায় ১০-১৫ দিনের জন্য। আকস্মিক বন্যার আশঙ্কায়ুক্ত এলাকার জন্য ব্রি জাত হলো বি ধান ৫১ ও ৫২। এরা ১০-১৫ দিনের জলমগ্নতা সহিষ্ণু এবং এরা স্বল্প আলোক সংবেদনশীল জাত। আলোক সংবেদনশীল কিন্তু নাবি রোপন করার গুণাগুণসম্পন্ন জাত হলো বি আর ২২, ২৩ এবং বি ধান ৪৬। এদের চাল মাঝারি মোটা থেকে লম্বা মোটা। বন্যা প্রবণ এলাকা যেখানে ১৫ ভাদ্রের পর আমনের চারা রোপনের উপযোগী সন্ধান নেই এ জাতগুলো আবাদ করা যায়। সমুদ্র উপকূলীয় লবণাক্ত পরিবেশের আমন ধানের জাত হলো বি ধান ৪০, ৪১, ৫৩ ও ৫৪। বি ধান ৫৩ ছাড়া বাকী ৩টি জাতই আলোক সংবেদনশীল। চারা ও গাছের প্রজনন পর্যায়ে এ চারটি জাতই ৮-১০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড লবণাক্ততা সহনশীল। জোয়ার ভাটা পরিবেশের আমন ধানের জাত হলো বি ধান ৪৮। এদের চাল বেশ মোটা। এটিও আলোক সংবেদনশীল জাত। জোয়ার ভাটা এলাকায় রোপনের জন্য চারা বড় হওয়া নরকর। এ ধানের চারা একটু বড় হলে তবে এদের রোপন করতে হয়।

বাংলাদেশে খরার প্রদূর্ভাব প্রায় প্রতি বছরই দেখা দেয়। আমাদের দেশের প্রায় ১.৭ মিলিয়ন হেক্টর ধানের জমি নানা মাত্রার খরা প্রবণ। বৃষ্টি নির্ভর উঁচু ভূমি সম্পূর্ণতা অর্থাৎ ০.৯ মিলিয়ন হেক্টরই খরা প্রবণ। তবে বৃষ্টি নির্ভর নিচু ভূমির প্রায় ০.৮ মিলিয়ন হেক্টরও প্রায়ই খরা পীড়িত হয়ে থাকে। বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের বৃষ্টিপাতের অসম বিন্যাসের কারণে বৃষ্টি নির্ভর আমন ধান প্রায়ই খরায় আক্রান্ত হয়। রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বগুড়া, পাবনা, দিনাজপুর, রংপুর এবং খুলনা জেলায় অধিক মাত্রায় খরা পরিলভি হয়। বাংলাদেশে উদ্ভাবিত তিনটি জাত যথা-বি ধান ৩৩, বিনা ধান-৭ বা বি ইউ ধান-১ আগাম পরিপক্ব স্বভাবের বলে এসব জাত আবাদ করে খরা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হতে পারে। বি ধান ৪২, ৪৩ এবং অতি সম্প্রতি অবমুক্তি পাওয়া বি ধান-৫৫, ৫৬ ও ৫৭ জাতগুলো ফসলের বিভিন্ন পর্যায়ে নানা মাত্রায় খরা সহিষ্ণু বলে চিহ্নিত। বি ধান ৫৬ ও ৫৭ বোনা আমনের জাত এবং এদের ফলন হেক্টর প্রতি ৪ টনেরও বেশী।

অতি সম্প্রতি আমন মৌসুমের তিনটি আধুনিক ধান জাত উদ্ভাবন করেছেন ব্রি বিজ্ঞানীরা। এ তিনটি জাত হলো-বি ধান ৫৫, ৫৬ ও ৫৭। এই তিনটি জাত আবার কিছুটা না কিছু মাত্রায় খরা সহনশীল। বি ধান ৫৪ আবার আউশের জন্যও উপযোগী জাত। বোরোতে এর জীবনকাল ১৪৫ দিন, রোপা আমনের ক্ষেত্রে ৯৫ দিন আবার বোনা আমনের জন্য তা ১০৫ দিন। বোঝাই যাচ্ছে এটি আসলে আলোক সংবেদনহীন একটি ধান জাত। এ জাতটি কিছুটা লবণাক্ততা, শৈত্য এবং খরা সহনশীল। বি ধান ৫৬ প্রজনন দশায় বেশ খরা সহিষ্ণু। অর্থাৎ

ধানের পুষ্পায়নের পর যখন পানির সংকট দেখা দিলে ফলন মারাত্মক ব্যাহত হবার কথা তখন এ ধান খরা সহিষ্ণু বলে তা যে এক পরম প্রত্যাশিত জাত আমাদের তা সহজেই অনুমান করা চলে। ব্রি ধান ৫৭-এর জীবনকাল মাত্র ১০৪ দিন। স্বল্প মেয়াদী এ জাতটির দানা আবার অনেকটা মিনিকেটের অনুরূপ। ধানের প্রজনন পর্যায়ে এ জাতটি খরা এড়ানোর এবং খরা সহিবার ক্ষমতা রয়েছে।

বোনা আউশ এবং রোপা আউশ দু'রকমের জাতই উদ্ভাবন করেছেন ব্রি বিজ্ঞানীগণ। আউশের সব জাতই আলোক সংবেদনহীন। এদের জীবনকালও বেশ কম। বোনা আউশ ধানের মধ্যে বৃষ্টিবহুল এলাকার উপযোগী জাতও হলো বি আর ২১, ২৪ এবং ব্রি ধান ২৭। বোনা আউশের কিন্তু খরা প্রবণ এবং বৃষ্টিবহুল উভয় এলাকায় আবাদ উপযোগী জাত রয়েছে। এরকম জাতগুলো হলো ব্রি ধান ৪২ এবং ৪৩। রোপা আউশের জাতগুলো হলো বি আর ২৬, ব্রি ধান ২৭ ও ৪৮। বোরো ধানের জন্য সময় কিছুটা বেশী লাগে। সে কারণেই এরা খাদ্য তৈরি করতে সক্ষম অধিক দিন। আর উৎপন্ন খাদ্যের অনেকটাই তারা ব্যয় করে দানা তৈরি করতে, তাই এদের ফলনও অন্য জাতের চেয়ে অধিক। জীবনকাল ১৫০ দিনের কম তেমন বোরো ধানের জাতগুলো হলো বি আর ১, ৬, ব্রি ধান ২৮ এবং ৪৫। এদের আগাম জাত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। জীবনকাল ১৫০ দিনের বেশি তেমন জাতগুলো হলো বি আর ১৪, ১৫ এবং ব্রি ধান ২৯। দীর্ঘ জীবনকাল সম্পন্ন এই জাতগুলো উর্বর জমি ও পানি সরবরাহ পেলে অধিক ফলন দিতে সক্ষম।

বোরো ধানের মধ্যে এদেশের জনপ্রিয় দু'টি জাত হলো ব্রি ধান-২৮ এবং ব্রি ধান ২৯। ব্রি ধান-২৮ জাত এসেছে বি আর ৬ (আই আর ২৮) এবং পূর্বচী নামক ধান জাতের মধ্যে ক্রস করে প্রাপ্ত উদ্ভিদকূল থেকে যাচাই বাছাইয়ের মধ্য দিয়ে। ১৯৯৪ সনে এই জাতটি অবমুক্ত করা হয়। জাতটির গড় উচ্চতা ৯০ সে.মি. আর গড় জীবনকাল ১৪০ দিন। এর চাল মাঝারি চিকন ও সাদা তুলনামূলকভাবে এটি ব্রি ধান ২৯ থেকে ২০ দিন আগে পাকে এবং ধানের মান ভাল বলে এই জাতটি বেশ জনপ্রিয়। ব্রি ধান ২৯ জাত টি এসেছে বি জি ৯০-২ এবং বি আর ৫১-৪৬-৫ এই দু'টি লাইন ক্রস করে প্রাপ্ত উদ্ভিদে নির্বাচন চালিয়ে। এটি এদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় জাত, কারণ এটি উত্তম পরিবেশ ও উত্তম পরিচর্যা বলে হেক্টর প্রতি গড়ে ৭.৫ টন পর্যন্ত ফলন দিতে পারে। আসলেই এটি বাংলাদেশের একটি মেগা ভ্যারাইটি। বোরো ধানের আবাদী এলাকার বড় অংশ দখল করে আছে এই দু'টি জাত।

অনেক সময় ঠাণ্ডা পড়লে ধান গাছ নষ্ট হয় বলে ধানের ফলন হ্রাস পায়। সে কথা মাথায় রেখে ঠাণ্ডা সহিষ্ণু আগাম জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। অধিক ঠাণ্ডার সময়ও তাই ব্রি ধান ৩৬ এর চারা কম মারা যায়। হাওড় এলাকার উপযোগী বোরো ধানের জাত হলো বি আর ১৭, ১৮ ও ১৯। কাণ্ড উঁচু বলে ফসল পাকার সময় ছোটো খোটো আগাম ঢলের সময় ধান তলিয়ে যায় না। শিলা প্রবণ এলাকার ধানের জাত হলো বি আর-৮ আর ৯। শিষের সাথে এসব জাতের ধান বেশ শক্ত হয়ে লেগে থাকে বলে সহজে শিলা বৃষ্টিতে ধান নষ্ট হয় না। বোরো ধানের মধ্যে সবচেয়ে লবণাক্ততা সহনশীল জাত হলো ব্রি ধান ৪৭। তিন সপ্তাহ পর্যন্ত এ ধানটি চারা অবস্থায় ১২-১৪ ডিএস/মিটার লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে। বাকী জীবনকালের জন্য এটি ১ ডিএস/মিটার লবণাক্ততা সহ্য করতে সক্ষম। আমাদের দেশের দণিষ্ণলের জন্য উপযোগী এটি একটি অন্যতম জাত। বোরো ধানের একটি সুগন্ধী জাতও রয়েছে আমাদের। বাশমতি চালের গ্রেডের মানসম্পন্ন এই জাতটি হলো ব্রি ধান ৫০। ভারত আর পাকিস্তানের বাশমতির সাথে যেন এর কোন নাম বিভ্রাট না ঘটে সেজন্য এই জাতটির নাম দেওয়া হয়েছে বাংলামতি। বাংলায় যে বাশমতির উদ্ভাবন করা হয়েছে তাঁর নাম বাংলামতি হতেই পারে। এ জাতের চাল বেশ সুগন্ধী যুক্ত, চিকন ও লম্বা।

বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলীয় এলাকার বিশাল অঞ্চলে নানা মাত্রার লবণাক্ততা রয়েছে এবং মৌসুম ভেদে একই স্থানে লবণাক্ততার মাত্রার তারতম্য ঘটে। খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালি, নোয়াখালি এবং চট্টগ্রাম জেলাসমূহের প্রায় ০.৮-৭৬ মিলিয়ন হেক্টর ভূমি লবণাক্ততার কবলে রয়েছে। খুলনা এবং পটুয়াখালি জেলায় সর্বাধিক লবণাক্ততা লক্ষ্য করা যায়। লবণাক্ততার কারণে এসব এলাকায় আধুনিক ধানের আবাদ করা হচ্ছে



সবচেয়ে কম। এক হিসেবে দেখা গেছে যে এসব এলাকায় আউশ, বোনা আমন এবং বোরোতে যথাক্রমে শতকরা ৬, ১৪ ও ২০ ভাগ এলাকায় আধুনিক ধানের আবাদ করা হচ্ছে। ব্রি এবং ইরির পারস্পরিক সহযোগিতায় লবণাক্ত এলাকার জন্য ধান জাত অবমুক্ত করা হয়েছে। ২০০৩ সনে ব্রি ধান ৪০ ও ৪১ নামে দু'টি লবণাক্ততা সহনশীল জাত অবমুক্ত করা হয়। ২০০৭ সনে এসে অবমুক্ত করা হয় ব্রি ধান ৪৭ নামক জাতটি। এটির লবণাক্ততা সহনশীল ক্ষমতা অধিক। পরবর্তীতে তিন বছরের মাথায় এসে অবমুক্ত করা হয় ব্রি ধান ৫৩ এবং ব্রি ধান ৫৪ নামক জাত দু'টি।

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। বহু নদী উপনদী আর শাখা নদী জালের মত সারা দেশে বিস্তৃত হয়ে আছে। এসব নদীর পানি বৃদ্ধির কারণে মৌসুমী বন্যা, বৃষ্টিপাতজনিত বন্যা, আকস্মিক বন্যা এবং সাইক্লোন বা ঘূর্ণিঝড়ের কারণে উপকূলীয় বন্যা এরকম নানারকম জলমগ্নতা ধানের বৃদ্ধি ও বিকাশ এবং এদের ফলনে মারাত্মক প্রভাব ফেলে। ইরি এবং ব্রি-এর সহযোগিতার মাধ্যমে জলমগ্নতা সহিষ্ণু ধান জাত উদ্ভাবনে বেশ সাফল্য অর্জিত হয়েছে। অতি সম্প্রতি মার্কাস সহায়ক ব্যাক ক্রসের মাধ্যমে পাওয়া স্বর্ণা-সাব ১ এবং বি আর ১১-সাব ১ দু'টি লাইনকে যথাক্রমে ব্রি ধান ৫১ এবং ব্রি ধান ৫২ নামে অবমুক্ত করা হয়েছে। দুই চার দিনের জলমগ্নতা এ দু'টি জাতের কোন ক্ষতিই করে না। অবশ্য এরা ১৭ দিন পর্যন্ত আকস্মিক বন্যা সহনশীল। তবে তিন সপ্তাহের জন্য ২৫ সে.মি. এর অধিক জলমগ্নতা এরা সহনশীল নয়।

বিনা থেকে উদ্ভাবিত ধান জাতের সংখ্যা হলো ৭টি। বিনা বিজ্ঞানীরা উফশী জাতগুলোতে নানারকম রশ্মি প্রয়োগ করে প্রত্যাশিত মিউট্যান্ট বাছাই করে এসব জাত উদ্ভাবন করেছেন। ১৯৭৫ সনে অবমুক্ত ইরাটম-২৪ জাতটি বোরো আর আউশ উভয় মৌসুমের জাত। এ জাতটি বাদামী দাগ পড়া রোগ আর কীট প্রতিরোধী। ১৯৮৭ সনে অবমুক্ত জাতটি হলো বিনাশাইল। নাইজার শাইলে গামা রশ্মি প্রয়োগ করে পাওয়া এই জাতটি বোনা আমন জাত। এটি পাতা বলসানো রোগ ও খোল পোড়া রোগ প্রতিরোধী। বন্যার পানি চলে গেলে এই জাতটি নাবী রোপন করা যায়। রেপা আমন ধানের আর একটি জাত হলো বিনা ধান-৪। এর এমাইলোজের পরিমাণ শতকরা ২৬ ভাগ আর প্রোটিনের পরিমাণ শতকরা ৮.৫ ভাগ। এটি খোল পোড়া রোগ এবং মাজরা পোকা ও সবুজ পাতা ফড়িং এর বিপক্ষে প্রতিরোধী।

১৯৯৮ সনে অবমুক্ত করা বিনার বোরো ধানের দু'টি জাত হলো বিনা ধান ৫, ৬। বিনা ধান ৫ এর আমিষের পরিমাণ শতকরা ৮.৪৪ ভাগ। এটি পাতা বলসানো, খোল পঁচা, খোল পোড়া এবং বাদামী গাছ ফড়িং এর বিপক্ষে মাঝারি প্রতিরোধক্ষম। বিনা ধান ৬ জাত অনেকটা বিনা ধান ৫ জাতের অনুরূপ। বিনা ধান ৭ জাতটি কিন্তু স্বল্প মেয়াদী জাত। রেপা আমন ধানের এই জাতটি ১১০-১২০ দিনে কর্তন উপযোগী হয়। বেশ কয়েকটি রোগ আর কীটপতঙ্গ প্রতিরোধী বিনার লবণাক্ত এলাকার জাত হলো বিনা ধান ৮ জাতটি। এই জাতটি পাতা বলসানো, খোল পোড়া, বাদামী গাছ ফড়িং এবং মাজরা পোকা কিছুটা সহিষ্ণু।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ধানের দু'টি জাত উদ্ভাবন করেছে। এ দু'টি জাত হলো বাউ ধান ১ ও বাউ ধান ২। বাউ ধান ১ জাত খানিকটা খরা প্রতিরোধী। সেচের সুবিধা নেই তেমন অঞ্চলে এই জাতটি মানানসই। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ২০০৮ সনে বি ইউ ধান ১ নামক একটি আমন মৌসুমের ধান জাত ২০০৮ অবমুক্ত করেছে। এই জাতটি খরা সহিষ্ণু, স্বল্প মেয়াদী এবং রোগ ও কীট পতঙ্গ প্রতিরোধী। উত্তরাঞ্চলের মঙ্গা পীড়িত এলাকার জন্য এই জাতটি অত্যন্ত কার্যকর।

বাংলাদেশে যেসব আধুনিক ধানের জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে এগুলোর সিংহ ভাগের পেরেন্ট আসলে ইরি থেকে উদ্ভাবিত পুরোগামী লাইন। কখনো সরাসরি এসব লাইনের মধ্যে যাচাই বাছাই পরিচালনা করে নির্বাচন করা হয়েছে কোন কোন উফশী জাত। কখনও আবার ইরির দু'টি লাইনের মধ্যে সংকরায়ন করে সৃষ্ট নানারকম ধান গাছ বাছাই করে পাওয়া গেছে কোন কোন জাত। আবার ইরি লাইনের সাথে সংকরায়ন করা হয়েছে এদেশে প্রবর্তিত ও বাছাইকৃত দু'একটি জাত। এভাবে সৃষ্ট হয়েছে তৃতীয় কোন জাত।

এদেশের অর্থনীতিতে ধান গবেষণার প্রভাব অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের রাজনীতির উত্থান

পতনও ধানের সাথে জড়িত। কৃষক যে বছর ভালভাবে ধান ঘরে তুলতে সক্ষম হয় সে বছর সরকারের একটি বড় দুশ্চিন্তার লাঘব ঘটে। ফলে ধান চাষ এবং ধান গবেষণা এ দেশের জন্য এ দুটোই খুব জরুরী বিষয়। কেবল প্রত্যাশিত ধানের জাত উদ্ভাবন আর এর আবাদ যে কত মানুষের দুঃখ কষ্ট দূর করে মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে পারে তার একটি জলন্ত উদাহরণ হলো ব্রি ধান ৩৩ এবং বিনা ধান ৭। বাংলাদেশের ভূখণ্ডে দীর্ঘকাল ধরে উত্তরাঞ্চলের মানুষ চৈত্র মাসে এক দারুণ অভাবের মধ্যে পড়ে যেত। একে ‘মঙ্গা’ নামক দুর্ভিক্ষ হিসেবে আখ্যায়িত করা হতো। ব্রি উদ্ভাবিত আগাম জাত ব্রি ধান ৩৩, বিনা উদ্ভাবিত আগাম জাত বিনা ধান ৭ মঙ্গা উপদ্রুত এলাকায় আবাদ করার সুবাদে উত্তর বঙ্গের দীর্ঘ দিনের ‘মঙ্গা’ সমস্যার সমাধান হয়েছে। এ দুটি ধানের জাতের ব্যবহার এ এলাকার লক্ষ লক্ষ মানুষের দুঃখ কষ্ট লাঘব করতে সক্ষম হয়েছে।

গত শতাব্দীর সত্তরের দশকে আধুনিক ধান জাতের গ্রহণযোগ্যতা বেশ কম ছিল। আশির দশকে এসে এসব জাতের আবাদী এলাকা বেশ সম্প্রসারিত হয় যা প্রায় শতকরা ৩৪ ভাগে পৌঁছে। তবে এই শতাব্দীতে এসে দেখা যাচ্ছে যে, আধুনিক ধান জাতের গ্রহণযোগ্যতা অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০০ সনে এসে দেখা যায় যে, ধানী এলাকার প্রায় শতকরা ৬৬ ভাগ এলাকা দখল করেছে আধুনিক জাতগুলো। এর দশ বছর পর ২০১০ সনে এসে আধুনিক জাতের আবাদী এলাকা বেড়ে শতকরা ৭৯ ভাগে দাঁড়িয়েছে। এসব জাতের বিস্তার লাভের কারণগুলো হলো-(১) নতুন নতুন আধুনিক ধান জাত উদ্ভাবন এবং এদের অধিক গ্রহণযোগ্যতা; (২) সেচ এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারী সহায়তা প্রদান এবং (৩) আধুনিক উৎপাদন উপকরণের উপর ভর্তুকি প্রদান ইত্যাদি।

উপযুক্ত পরিবেশ ও উচ্চ উপকরণ নির্ভর ধান জাতের উদ্ভাবন এবং এদের অধিক ফলনের কারণে বিভিন্ন ধানী মৌসুমে ধান আবাদে চলচিত্র অনেকটাই পাল্টে গেছে। আধুনিক ধান জাত উদ্ভাবন ও এদের প্রসারের ফলে গত চার দশক ধরে অটুট এবং অম্লনের অবসান এলাকা অনেকটাই কমেছে। অন্যদিকে বেড়েছে বোরোর এলাকা তাৎপর্যপূর্ণভাবে। ১৯৭১ সনে যেখানে বোরো ধান আবাদ করা হতো ০.৩২ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে সেটি ২০১০ সনে এসে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪.৭ মিলিয়ন হেক্টরে।

আধুনিক ধান জাতের চাষাবাদের ফলে ধানের ফলনও বেড়েছে উল্লেখযোগ্যরকম। গত চল্লিশ বছরের ধান প্রজনন কার্যক্রম ধানের উৎপাদন বাড়িয়েছে সরাসরি তিনগুণ। ১৯৭১ থেকে ১৯৮০ এই সময়কালের মধ্যে মোট ধান উৎপাদনের শতকরা ২৯ ভাগ অবদান ছিল আধুনিক জাতের। ১৯৮১-৮৫ সময়কালে এটি বেড়ে হয়েছে শতকরা ৪১ ভাগ যা ১৯৯১-৯৫ সনে এসে শতকরা ৬৫ ভাগে দাঁড়ায়। আধুনিক ধান জাতের আবাদ কতটা প্রভাব ফেলেছে আমাদের মোট ধানের উৎপাদনের তা বোঝা যায় ২০০৯-১০ এর পরিসংখ্যান দেখলে। এ সময় আধুনিক জাতের অবদান বেড়ে দাঁড়িয়েছে শতকরা ৯০ ভাগে।

ড. মোঃ শহীদুর রশীদ ভূঁইয়া  
প্রফেসর, কৌলিত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ  
এবং  
প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর  
শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

## শিশুর ডেঙ্গু জ্বর

ডেঙ্গু একটি আতঙ্কের নাম, তা আবার যদি হয় শিশুর। তবে আমার এ লেখার উদ্দেশ্য সেই আতঙ্কে উদ্বেগ দোয়া নয় - বরং তা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য। যে কোন বিষয়ে ধারণার অভাবেই তা ভীতির কারণ হয়ে উঠে, আর জেনে-বুঝে মোকাবেলার শক্তি সঞ্চয়ের মাঝেই তার প্রতিকার করা সম্ভব হয়।

ডেঙ্গু জ্বর একটি ভাইরাস দিয়ে হয়, তবে এই ভাইরাসের চারটি type আছে, যথা-DEN-1, 2, 3, 4। তাই একবার ডেঙ্গু হলে আর হবে না-এই ধারণা যারা পোষন করেন তাদের উদ্দেশ্যে বলি, ডেঙ্গু জ্বর বার বার হতে পারে। আর আমাদের দেশে অদ্যাবধি যে আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশগত অবস্থা তাতে ডেঙ্গু আধিপত্য করবে সন্দেহ নেই।

ডেঙ্গু সাধারণতঃ বর্ষা মৌসুমের শেষ ভাগে বেশী হয়। যেমন-জুলাই থেকে অক্টোবর। তাই এ সময়টাতে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা আর মশার কামড় থেকে বাঁচার জন্য সর্বতো চেষ্টা করা আবশ্যিক। তারপরও রক্ষা না হলে প্রতিকার-প্রাথমিক ভাবে বাসায়, পরবর্তীতে চিকিৎসকের মাধ্যমে।

ডেঙ্গু মানে চোখ লাল হওয়া, শরীর থেকে রক্ত যাওয়া, অজ্ঞান হওয়া-এমনটি ধারণা আমরা অনেকেই পোষণ করি। তবে সেটা রোগের জটিল বা অনেক শেষ অবস্থার লক্ষণ। প্রাথমিক লক্ষণ জেনে ব্যবস্থা না নিলে চিকিৎসা অনেক সময় দুরূহ হতে পারে।

শিশুদের ক্ষেত্রে ডেঙ্গুর লক্ষণ বুঝতে পারা অনেকটাই কঠিন। কারণ, শিশু তার শারীরিক কষ্টের কথা প্রকাশ করতে পারে না। সে ক্ষেত্রে সচেতনতা আর সুস্থ পর্যবেক্ষণ একটু বেশীই দরকার। প্রয়োজন হলে দ্রুত অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়াটাই শ্রেয়।

কঠিন হলেও প্রাথমিক কিছু লক্ষণ পর্যালোচনা করে শিশুর ডেঙ্গু জ্বর অনুমান করা এবং তদসাথে প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু করা সম্ভব।

সাধারণ ভাইরাস জ্বরের মতই হঠাৎ বেশী জ্বর, সর্দি, সামান্য গলাব্যথা ও গলার ভিতর লালচে ভাব, কাশি, হাত-পা এবং মাথা ব্যথা দিয়ে শুরু হয়। তারপর ক্ষুধামন্দা, বমি বমি ভাব, এমনকি বমিও হতে পারে। ২৪ থেকে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে হালকা গুড়ি লাল দানা সারা শরীরে দেখা দিতে পারে, যা চাপ দিলে চলে যায়। এ সময় শিশুকে স্বাভাবিক খাবারসহ পর্যাপ্ত তরল, মাথায় ভিজানো কাপড় ও জ্বরের ঔষধ প্যারাসিটামল ব্যবহার করা যেতে পারে।

জ্বর সাধারণতঃ ২-৫ দিনের মধ্যে ভাল হয়ে যায়। তবে এর মাঝে যদি শিশুর দুর্বলতা দেখা দেয়, হাত-পা চুলকায়, শরীরে হাত দিলে ব্যথা অনুভব করে সহজেই কাঁদতে থাকে, জ্বর ভাল হয়ে আবার জ্বর আসে, তা কিন্তু জটিলতার ইঙ্গিত। এমনটি হ'লে দ্রুত শিশু বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে যথাযথ চিকিৎসা নেয়া বাঞ্ছনীয়।

মনে রাখবেন, ডেঙ্গু জ্বর মানেই খুব খারাপ কিছু নয়। সঠিক পরিচর্যা আর চিকিৎসায় বেশীর ভাগই ভাল হয়ে যায়। তবে জটিলতা সৃষ্টির পূর্বেই প্রতিকারের পদক্ষেপ নেয়াটা অতীব জরুরী।

ডাঃ রবি বিশ্বাস  
শিশু স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ  
ঢাকা শিশু হাসপাতাল  
ঢাকা

## আপেক্ষিক তত্ত্বের শতবার্ষিকী

ঠিক একশ বছর আগে ১৯০৫ সালে পেটেন্ট অফিসের একজন কেরানি পরপর পাঁচটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখে বিজ্ঞান জগতে আলোড়ন তুলেছিলেন। প্রবন্ধগুলোর একটি ছিল 'থিউরি অব রিলিটিভিটি' আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ। প্রবন্ধটি পদার্থ বিজ্ঞানের ইতিহাসে এবং মানব জাতির চিন্তার জগতে বিপ্লব এনেছিল। আইনস্টাইনের নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে আপেক্ষিকতাবাদ বা রিলিটিভিটি তত্ত্ব। তিনি সেখানে প্রমাণ করে



আলবার্ট আইনস্টাইন

দেখিয়েছিলেন যে, মানুষ এতদিন যা সত্য বলে জেনে এসেছে তা প্রকৃত পক্ষে সত্য নয়। ঐ পাঁচটি প্রবন্ধের রচয়িতা ছিলেন ২৬ বছরের আলবার্ট আইনস্টাইন। ঐ প্রবন্ধ ও তাঁর রচয়িতার সম্মানে জাতিসংঘ ২০০৫ সালকে ঘোষণা করেছে আন্তর্জাতিক পদার্থবিজ্ঞান বর্ষ (World year of physics) হিসেবে। এ থেকে বুঝা যায় পৃথিবীর ইতিহাসে আইনস্টাইনের স্থান কে'থায়। শুধুমাত্র এই ঘোষণার মাধ্যমেই নয়, বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তের একটি জরিপে আলবার্ট আইনস্টাইন মানুষের মনের কোন মণিকে'থায় অবস্থান করছেন তারও একটা হিসেব পাওয়া যায়। বিশ্ববিখ্যাত বার্তা সংস্থা বয়ট'ব ও টাইম ম্যাগাজিন ১৯৯৯ সালের শেষ কয়েক মাস ধরে শুধু বিংশ শতাব্দী নয়, আবও বহুদূর পিছিয়ে পুরো সহস্রাব্দব্যাপী সমীক্ষা চালিয়ে এর মধ্যে জনগ্রহণকারী শ্রেষ্ঠ মনীষীদের বেছে আনতে চেষ্টা করেন। এই দুই সংস্থা রেডিও, টেলিভিশন এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানুষের মতামত যাচাই-বাছাই করে যে উপাত্ত সংগ্রহ করে তাতে দেখা যায়, শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, রাজনীতি বা অন্যান্য যেকোনো ক্ষেত্রের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষীর আসনটি দখল করে নিয়েছেন আলবার্ট আইনস্টাইন। তাই আইনস্টাইন আজ সত্যিকার অর্থে সহস্রাব্দের সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষী।

আলবার্ট আইনস্টাইন ১৯০৫ সালের পর সবচেয়ে আলোচিত ব্যক্তিত্ব। তাকে বর্তমান যুগে আহ্বারূপেও স্বীকৃতি দেওয়া হয়। অতীতের হাজার হাজার বছরের বিজ্ঞান, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও দর্শনের সমন্বিত ফসল এই বিজ্ঞানী। এই অর্থে তিনি অতীত ও বর্তমানের যোগসূত্র।

আন্তর্জাতিক পদার্থবিজ্ঞান বর্ষ ২০০৫ উপলক্ষে সারা পৃথিবী জুড়ে তাঁর জীবন, কর্ম, সাধনা ও আদর্শ নিয়ে প্রচুর সেমিনার-সিম্পোজিয়াম, লেখালেখি হচ্ছে। শিল্পী তৈলচিত্র আঁকেছেন, ভাস্কর পাথর খোদাই করে তাঁর মূর্তি বানিয়েছেন, তাঁকে কেন্দ্র করে বেরিয়েছে অসংখ্য জার্নাল, ডাকটিকেট, পোস্টার, পত্র-পত্রিকায় ছাপানো হচ্ছে বিভিন্ন নিবন্ধ। আমাদের দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সমিতি তাঁর কর্মময় জীবন নিয়ে বিভিন্ন কর্মশালার আয়োজন করছে।

আইনস্টাইন সন্দেহও একমাত্র বিজ্ঞানী যিনি চিত্র তারকার চেয়েও সাধারণ মানুষের কাছে জনপ্রিয় ছিলেন, যার তত্ত্ব সম্পর্কে বহুত'র স্নেহে অবিজ্ঞানীরাও টিকেট কেটে ভিড় জমাত বক্তৃত'র কক্ষে। আমরা অনেক কবি ও শিল্পীর জন্মবার্ষিকী পালিত হতে দেখেছি। কিন্তু আইনস্টাইন ছাড়া অন্য কোনো বিজ্ঞানীর কথা আমরা ভাবতে পারি না, যার কর্মময় জীবন নিয়ে এমন বিপুল আয়োজন সমগ্র পৃথিবী জুড়ে উদযাপন করা হয়েছে কখনো। সেমিনার, আলোচনা, প্রবন্ধপাঠ ও গ্রন্থ প্রকাশনার মধ্য দিয়ে একজন বিজ্ঞানীর জীবন ও কর্মকে বুঝাবার এই বিশ্বজোড়া আয়োজন স্বভাবতই প্রশ্ন জাগায় কি সেই বিশেষ গুণ ও কর্ম যা আইনস্টাইনকে এত সার্বজনীন ও শ্রদ্ধেয় করেছে।

আপেক্ষিক শব্দের সাথে আমরা সবাই পরিচিত। আপেক্ষিক শব্দটি হল আপেক্ষিকতার বিশেষণ আর মানে



হল অপেক্ষাকৃত। এর বিশেষ্য হল আপেক্ষিকতা। আমরা যখন কোনো বিষয় সম্পর্কে বলি তখন নিজেদের অগোচরেই আপেক্ষিক বিবেচনা করেই বলি। যেমন আজ গরম। এ কথার মানে কালকের অপেক্ষায় আজ গরম। মেয়েটি সুন্দরী। মানে ঐ মেয়েটির অপেক্ষায় সুন্দরী। ঘরটি বড় ইত্যাদি। এরপরও এই আপেক্ষিকতা সারা পৃথিবীতে এত ঝড় তুলল? প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক।

আইনস্টাইনের আগের দুনিয়ার সবচেয়ে বড় বিজ্ঞানী ছিলেন নিউটন। নিউটনের মতে স্থান (Space), কাল (Time) ভর (Mass), ধ্রুবক, এগুলো আপেক্ষিক নয়। আইনস্টাইন এ ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন যে, স্থান, কাল, ভর, ধ্রুবক বা পরম কিছু নয়—এগুলো আপেক্ষিক। তাই আইনস্টাইনের তত্ত্বকে বলা হয় আপেক্ষিকতা তত্ত্ব। কিন্তু এই কথা বলা মানে আপেক্ষিকতার সব বলা নয়। নয় এটা আপেক্ষিকতার অন্তর্নিহিত কথা।

নিউটনের গতির তিনটি সূত্র আর মহাকর্ষ তত্ত্ব মনে হল এদিয়ে বিশ্বের সব নিয়ম লিখা হয়ে গেছে। কিন্তু আইনস্টাইন নিউটনের কল্পিত বিশ্বশ্রুতির ধারণাকে সম্পূর্ণ বদলে ফেলল। তিনি বললেন আমাদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চতুর্থমাত্রা বলে একটা জিনিস আছে। আমাদের আশপাশের জিনিস সময় সময় খাটো হয়, আবার লম্বা হয়। দুনিয়াটা বেলুনের মতো চুপসে যায়, আবার ফুলে ফেঁপে ওঠে। অর্থাৎ কিনা যা সবকিছু বিদ্যুটে রকম আপেক্ষিক এবং রহস্যময়। আমরা সাধারণ মানুষ স্থান বা কালের চরিত্র নিয়ে তেমন মাথা ঘামাই না; কেননা এগুলোকে আমরা চিরাচরিত সত্য বলে গ্রহণ করি। আইনস্টাইন তা করেননি। তিনি স্থান ও কালের চরিত্র নিয়ে তুলেছেন মৌলিক প্রশ্ন।

মাত্র ১৬ বছর বয়সেই আইনস্টাইনের মনে দেখা দিয়েছিল এই অদ্ভুত সমস্যা। আমি যদি দৌড়াই একটি আলোর রশ্মির সাথে সমান বেগে তাহলে সে রশ্মিকে কেমন দেখাবে, কত মনে হবে তার বেগ? তখন তিনি এর জবাব ভেবেছিলেন ‘মনে হবে একটা বিদ্যুৎ চৌম্বক তরঙ্গ স্থির গতিহীন হয়ে আছে।’ কিন্তু পরে তিনি দেখলেন এটা অসম্ভব। গতি না থাকলে তো থাকে না আলোর স্পন্দন বা শক্তি, থাকে না আলোর অস্তিত্বই। তাই তিনি সিদ্ধান্ত করলেন আসলে বিশ্বে আর সবকিছুর গতি আপেক্ষিক হলেও আলোর বেগ নিরপেক্ষ ধ্রুব। দর্শকের বেগ যাই হোক আর যেভাবেই মাপা হোক আলোর বেগ সবসময় একই পাওয়া যাবে।

আইনস্টাইনের প্রথম কথা হল; নিউটন গোড়াতেই স্থান, কাল, ভর, বেগ এগুলোর একটা পরম মানদণ্ড ধরে নিয়েছেন। কিন্তু সত্যি সত্যি পরম মান বলে কিছু কি আছে? ধরা যাক, পরম গতির কথাটাই। কেউ যদি বলে ঘন্টায় ৫০ কিমি. বেগে গাড়িটা ছুটছে। আর যদি তাকে সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করা হয় ঘন্টায় ৫০ কিমি. কার সঙ্গে আপেক্ষিকভাবে, তাহলে সে নিশ্চয় বেজায়রকম অবাক হবে। কিন্তু প্রশ্নটার অর্থ আছে। রাস্তার ধারে যদি একজন লোক দাঁড়িয়ে থাকে তাহলে তার সঙ্গে তুলনায় গাড়ির বেগ ঘন্টায় ৫০ কিমি. ঠিকই। কিন্তু অন্য গতিশীল যানের জন্য, ঐ গাড়ির লোকের জন্য, বিশ্বের বাইরের অন্য কোথাও থেকে দেখলে একেক ক্ষেত্রে একেক রকম হবে। যেমন কেউ যদি আরেকটা মটরে চেপে একই বেগে উল্টো দিকে ছুটতে থাকে, তাহলে তার কাছে মনে হবে আগের গাড়িটা ছুটে যাচ্ছে ঘন্টায় (৫০+৫০) ১০০ কিমি. বেগে। আবার আগের গাড়ির ভেতরে যে লোকটি বসে আছে তার তুলনায় গাড়ির বেগ শূন্য। তাহলেই দেখা যাচ্ছে কোনো জিনিসের বেগের ধারণা দর্শকের নিজের অবস্থানের ওপর নির্ভর করে। এরপরও আমরা বলি, গাড়ির বেগ ঘন্টায় ৫০ কিমি.। কেননা আশপাশের সব স্থির জিনিস, রাস্তা অর্থাৎ পৃথিবীর সাথে তুলনায় তার বেগ। কিন্তু পৃথিবী কি স্থির? ঐ গাড়িটি দর্শক যদি চাঁদ কিংবা অন্য কোনো গ্রহ থেকে দেখে (যদি সম্ভব হয়) তাহলে তার কাছে এর বেগ কত বলে মনে হবে? সূর্যের চারপাশে গোটা পৃথিবী ঘুরছে সেকেন্ডে প্রায় ৩০ কিমি. বেগে। কাজেই তার তুলনায় গাড়ির বেগ কী দাঁড়ায়? বিশ্বে এমন একটি স্থির বিন্দু নেই যার তুলনায় কোনো জিনিসের পরম গতি বের করা যেতে পারে। কাজেই পরীক্ষার সাহায্যে পরম গতি বের করা অসম্ভব কল্পনা। পরীক্ষায় পাওয়া গেছে, বিশ্বের একমাত্র আলোর বেগই হল পরম। দর্শকের অবস্থা বা গতি যাই হোক না কেন, তার কাছে আলোর বেগের মান সবসময় একই হবে। শুধু তাই নয়, আলোর বেগ হলো চূড়ান্ত বেগ—এর চেয়ে বেশি কোনো জিনিসের বেগ হতে পারে না।

কোনো জিনিসের বেগ যদি হয় প্রচণ্ড রকম, আলোর বেগের কাছাকাছি, তাহলে কি তার বর্তমান দৈর্ঘ্য,



সময়ের হিসেবে একই থাকবে? আইনস্টাইন বললেন-থাকবে না, বেগ বাড়লে স্থির কাঠামোর তুলনায় ভর বাড়বে, দৈর্ঘ্য কমবে, কমবে সময়ের হিসেবও। আলোর বেগের অর্ধেক বেগ পর্যন্ত এই পরিবর্তন হবে খুবই ধীরে ধীরে, আলোর বেগের যত কাছাকাছি পৌঁছানো যাবে পরিবর্তন হবে তত তাড়াতাড়ি। তারপর চূড়ান্ত সীমানায় পৌঁছতে পৌঁছতে ভর হয়ে ওঠবে অনন্ত, দৈর্ঘ্য দাঁড়াবে শূন্যের কোঠায়, আর সময় যাবে থেমে।

আধুনিক বিজ্ঞানে আলোর বেগের কাছাকাছি বেগ বিশিষ্ট পারমাণবিক কণিকা নিয়ে অনবরতই পরীক্ষা চলছে, সেখানে মিলছে আইনস্টাইনের সিদ্ধান্তের নির্ভুল প্রমাণ। চারমাত্রার জগৎ নিয়ে আইনস্টাইন মহাকর্ষ তত্ত্বের একটা আশ্চর্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন। নিউটন ধরে নিয়েছিলেন, বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করার একটা প্রবণতা রয়েছে। তাই মহাকর্ষ ক্ষেত্রের মধ্যে কোনো জিনিসের গতিপথ বেঁকে যায়-যেমন একটা বলকে সমান্তরালভাবে শূন্যে ছুঁড়ে দিলে সেটা সরল পথে না গিয়ে বেঁকে মাটিতে পড়ে। আইনস্টাইন দেখালেন এই রহস্যের আকর্ষণ শক্তি কল্পনা করবার কোনো প্রয়োজন নেই। আসলে বিশ্বের আসল রূপ কী সেটা জানা দরকার। তিনমাত্রার জগতে রূপ এমন যে, তাতে বস্তুর উপস্থিতি ঘটলেই সেখানে আর ইউক্লিডের জ্যামিতি দিয়ে কাজ চলে না। স্থান যায় বেঁকে, সবচেয়ে সহজ পথ হয়ে দাঁড়ায় বাঁকা রেখা। তাই মনে হয় বলটা কোনো রহস্যময় আকর্ষণের টানে তার সরল পথ থেকে বিচ্যুত হচ্ছে। আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতায় কোনো চলন্ত বস্তুর দিক বা বেগ পরিবর্তনের একটা প্রধান কারণ হল মহাকর্ষ। কাছে অন্য বস্তু বা মহাকর্ষের উপস্থিতি না ঘটলে চলন্ত বস্তু একই বেগে সরল রেখায় চলতে থাকে। আইনস্টাইন বললেন, অন্য বস্তুর উপস্থিতিতে স্থানের প্রকৃতিই যায় বদলে, তাই চলন্ত বস্তুর পথ যায় বেঁকে। বস্তুর উপস্থিতিতে স্থানের এই অন্তর্নিহিত বক্রতার জন্যই সূর্যের চারপাশে ঘোরে পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ। অর্থাৎ আইনস্টাইনের জগতে দুটি বস্তুর মধ্যে মহাকর্ষ শক্তি অদৃশ্য হয়ে গেল। দেখা দিল ভারি বস্তুর কাছাকাছি স্থানের নিজস্ব বক্রতা।

আইনস্টাইনের তত্ত্বের প্রথম পরীক্ষার নির্ভুল প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯১৯ সালের ২৯ মে তারিখ পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সময় ছবি তুলে দেখা গেল সূর্যের আশপাশে তারার অবস্থান সত্যি মনে হচ্ছে তাদের স্বাভাবিক অবস্থানের চেয়ে ভিন্ন, আর তাতেই প্রমাণ পাওয়া গেল তারার আলোর পথ বেঁকে গিয়েছে সূর্যের অবয়বের পাশ দিয়ে আসতে।

পরবর্তীকালে উন্নততর প্রযুক্তির উদ্ভব ঘটেছে-বেতার দূরবিন, হাবলটেলিস্কোপ। অবিশ্বাস্য আকর্ষণ শক্তিময় কৃষ্ণবিবরের সন্ধান পাওয়া গেছে, যার কাছাকাছি পৌঁছলে সকল বস্তু, এমন কি আলোও হারিয়ে যায় অতল অন্ধকারে। আর বলাই বাহুল্য; ২য় মহাযুদ্ধের শেষের দিকে বস্তু আর শক্তির অভিন্নতার সমীকরণের বাস্তব প্রয়োগ দেখা দিয়েছে পারমাণবিক শক্তির উদ্ভাবনের মধ্যে।

অ্যারিস্টটল বলেছিলেন-আমাদের সমস্ত অজানা রহস্যের মধ্যে কাল বা সময় হচ্ছে সবচেয়েই রহস্যময়। আর এই সময় এবং স্থানকে (দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা) একই পর্যায় এসে বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্ব চতুর্থ মাত্রিক জগতের ধারণা সৃষ্টি করেছে। চতুর্থ মাত্রিক জগতের তিনমাত্রা হল-দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা এবং চতুর্থ মাত্রা হল সময়, আমাদের চির পরিচিত ত্রিমাত্রিক জগৎ থেকে খুব বেশি আলাদা নয়-যদিও ছবি ঐকে চারটি মাত্রা একসঙ্গে দেখানো অসম্ভব।

বিশেষ আপেক্ষিকতত্ত্বের চতুর্মাত্রিক জগতের বৈশিষ্ট্য হল এই যে-সব জড় কাঠামোয় পদার্থ বিজ্ঞানের আইন একই রূপ নেয়। আবার এক জড় কাঠামো থেকে অন্য জড় কাঠামোতে যেতে শুধুমাত্র লোরেন্স রূপান্তর সমীকরণই ব্যবহার করা যায়। এটাই হল বিশেষ আপেক্ষিকতত্ত্বের শিক্ষা।

অভিকর্ষ-উদ্ভূত হয় একটি ক্ষুদ্র স্থানকাল অংশ থেকে তার নিকটবর্তী অংশের মধ্যে পার্থক্যের জন্যই। এই পার্থক্যকে আমরা বলি অভিকর্ষ, স্থানকালের বক্রতা, বা সাধারণ আপেক্ষিকতা। বিশেষ আপেক্ষিকতত্ত্বে আইনস্টাইন ইথার তত্ত্বের সমাধি রচনা করেছিলেন। সাধারণ আপেক্ষিকতত্ত্বে মাধ্যাকর্ষণ শক্তিও বিলুপ্ত হয়ে গেল শুধু রেখে গেল স্থানকালের বক্রতা।

নিউটনের মাধ্যাকর্ষণের আইন এই ভাবে সাধারণ আপেক্ষিকতত্ত্বে ব্যাখ্যা করা হয়। নিউটন মাধ্যাকর্ষণের

জন্য যে ভূরণের আবিষ্কার করেছিলেন তা আসলে মহাবিশ্বের বক্রতার প্রকাশ মাত্র। এটাই সাধারণ আপেক্ষিকতত্ত্বের যুগান্তকারী শিক্ষা।

এই যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত থেকে গণিতের সিঁড়ি বেয়ে আইনস্টাইন যেসব সিদ্ধান্তে পৌঁছিলেন সেগুলোও আপাতত-অসম্ভব মনে হয়।

স্থান পরিবর্তন হতে পারে কালে, তেমনি কাল স্থানে।

বস্তু শক্তিতে পরিণত করা যায়, শক্তিকে বস্তুতে।

দর্শক যদি ছোট্ট প্রায় আলোর বেগে তাহলে স্থান সংকুচিত হয়, কাল প্রসারিত হয়, বস্তুর ভর বাড়ে।

আলোর সমান বেগে ছুটলে স্থান সংকুচিত হয়ে শূন্য এসে দাঁড়ায়, কাল বেড়ে হয় অনন্ত, আর বস্তুর ভর হয়ে দাঁড়ায় অসীম।

অসীম ভরের বস্তুকে নড়াতে হলে অসীম শক্তির যোগান চাই, কাজেই কোনো বস্তুর পক্ষেই আলোর সমান বেগ অর্জন সম্ভব নয়। আলোর ভর নেই, তাই আলো ছুটেতে পারে আলোর বেগে অর্থাৎ আলোক-কণিকা বা ফোটনের বিচিত্র জগতে স্থান শূন্য আর কাল সীমাহীন।

আইনস্টাইনের নানা বিস্ময়কর সিদ্ধান্তের একটি হল দ্রুত বেগবান অবস্থায় সময়ের মন্থরতা। এর দৃষ্টান্ত দেয়া হয় এভাবে-দুজন যমজ নভোচারীর একজন যদি অপেক্ষা করে পৃথিবীতে আর অন্যজন আলোর কাছাকাছি বেগে দীর্ঘ সময় ঘুরে বেড়ায় মহাশূন্যে নক্ষত্রলোকে, তাহলে সে পৃথিবীতে ফিরে এলে দেখবে তার পৃথিবীর সঙ্গী বুড়িয়ে গিয়েছে।

অথচ সে রয়েছে তরুণ।

আইনস্টাইনের মতে বিশ্ব জগৎ হচ্ছে ঘটনার বা আলোক তরঙ্গের লীলাখেলা। যখন আমরা বলি, পানি দেখছি তখন বস্তুত আমরা প্রত্যক্ষ করছি পানি হতে আলোর প্রতিফলন রূপ ঘটনাকে। বিশ্বজগতের কোনো বস্তুই স্থির নয়, সবই চঞ্চল ও গতিশীল। আমরা মেপে যে গতি বের করি তা ধ্রুবগতি নয়-আপেক্ষিক গতি। সেরূপ কালেরও কোনো স্থিরতা নেই। কোনো ঘটনা যখন ঘটে, সেই ঘটনার সময়টি যারা ঐ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন, তাদের সকলের নিকট এক হতে পারে না। সুদূর নক্ষত্রপিণ্ডে যদি কোনো ঘটনা ঘটে, আর ঐ নক্ষত্র থেকে আলো পৃথিবীতে আসতে যদি সময় লাগে দশ বছর তবে ঐ নক্ষত্রবাসী যে ঘটনা এখন দেখবে আমরা পৃথিবীবাসী তা দেখবো ১০ বছর পরে। অর্থাৎ নক্ষত্রবাসীর কাছে যা বর্তমান ঘটনা, আমাদের কাছে তা ভবিষ্যৎ এবং আমাদের কাছে যা বর্তমান দূরের কোনো এক নক্ষত্রবাসীর কাছে তা অতীত। সুতরাং ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান সবার কাছে এক নয়, একেক অবস্থানের লোকের কাছে একেক রকম। তাই তারা আপেক্ষিক। আমরা যদি এমন কোনো রকেট সৃষ্টি করতে পারতাম যার গতি হবে আলোর গতির ৪০ গুণ বেশি, তবে ঐ রকেটে চড়ে ৪০ বছর আগেকার কোনো অতীত ঘটনার পেছনে ছুটে তার পুরাভিনয় আবার আমরা দেখতে পেতাম। ৪০ বছর আগে সংঘটিত আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সব ঘটনাই আমরা আবার এই মুহূর্তে প্রত্যক্ষ করতে পারতাম।

আইনস্টাইন প্রশ্ন তুলেছেন আমরা অতীতকে মনে রাখতে পারি, কিন্তু ভবিষ্যতকে নয় কেন? অতীতের টেবিলের ওপরের কাপ অনায়াসে ভবিষ্যতের মেঝের অনেকগুলো ভাঙ্গা কাপের টুকরোর দিকে যেতে পারে, কিন্তু উলটোটা কখনো নয় কেন? কেন আমরা ভাঙ্গা কাপের টুকরোগুলোকে মেঝে থেকে উঠে এক জায়গায় জড়ো হয়ে জোড়া লেগে টেবিলের ওপর কাপ হতে দেখি না। শুনতে আশ্চর্য লাগে, এও কি কখনও সম্ভব হতে পারে! কিন্তু আইনস্টাইন বললেন, এও সম্ভব হতে পারে।

আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব অত্যন্ত দূরূহ মনে হলেও মৌলিক ধারণা অতটা জটিল নয়। তবে ধারণা সহজ হলেও তার গাণিতিক প্রকাশ সহজ নয়। আপেক্ষিক তত্ত্ব বোঝার জন্য গণিতে যে পরিমাণ দখল থাকা দরকার তা আমাদের না থাকায় এ তত্ত্ব আমাদের কাছে এত দূরূহ মনে হয়। আইনস্টাইনের মৃত্যুর পর তাঁর মস্তিষ্ক নিয়ে নানা গবেষণা হচ্ছে। ১৯৯৯ সালে এক গবেষণায় দাবি করা হয়েছে, মাথার যে অংশটি অঙ্ক করে

আইনস্টাইনের সে অংশটি অন্যদের তুলনায় ১৫ শতাংশ বড়। তাঁর মেধা অন্যদের চেয়ে এত বেশি যে, অনেকে বলেন—তিনি আসলে পৃথিবীর লোকই নন তিনি গ্রহান্তরের আগন্তুক। এর পরও আইনস্টাইনের মতো লোক তাঁর আপেক্ষিক তত্ত্বের গণিতের ভাষা খুঁজে বেরিয়েছেন প্রায় ১০ বছর ধরে। এখানে তাঁকে পথ দেখিয়েছেন তাঁর বন্ধু থ্রেসম্যান। আবার তত্ত্বের সমীকরণ সমাধানের অপূর্ব কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন সোয়ার্টসচিল্ড, কের, রবার্টসন ও অন্যান্যরা।

আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব প্রকাশের পর প্রায় ১০০ বছর পার হয়ে গেছে। এর ওপর হাজার হাজার বই প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে এর ব্যাখ্যা এখনও অস্পষ্ট হয়ে আছে। আপেক্ষিক তত্ত্ব সহজে না বোঝার কারণ হল (গণিত ছাড়া) জন্মের পর থেকে মানুষ বিশ্বজগৎ সম্পর্কে যে জ্ঞান লাভ করেছে এবং সে সব বিষয় নিয়ে তাঁর অন্তরে যে কল্পনার জগৎ সৃষ্টি হয়ে আছে, সেই জগৎ থেকে বেড়িয়ে আসতে না পারা। বিজ্ঞান গবেষণার সকল প্রকার ফল গবেষণাগারে পরীক্ষিত হয়ে থাকে। কিন্তু আপেক্ষিক তত্ত্ব এমন এক বিষয় যা গবেষণাগারে পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই খুবই দুরূহ কাজ।

বিংশ শতাব্দীর ২য় দশক পর্যন্ত থিউরি অব রিলেটিভিটির মর্ম উপলব্ধির করার মতো জ্ঞান খুব কম লোকের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। এক সময় মনে করা হত আইনস্টাইন ছাড়া এই থিউরি বুঝার মত ২য় ব্যক্তি ছিলেন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্যার আর্থার এডিংটন। তখন ভারতের একজন বিজ্ঞানী সুব্রহ্মণ্যম চন্দ্রসেখর নিজে নিজেই এই থিউরি নিয়ে গবেষণা করে এই বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ হন। একজন সাংবাদিক চন্দ্র শেখরের এ বিষয়ে অবহিত হয়ে স্যার এডিংটনকে প্রশ্ন করেছিলেন—শুনেছি পৃথিবীতে থিউরি অব রিলেটিভিটি নাকি বোঝে মাত্র তিনজন ব্যক্তি। এই কথা শুনে এডিংটন একটু থেমে উত্তর দিয়েছিলেন—আমি ভাবতে চেষ্টা করছি ৩য় ব্যক্তিটি কে? আইনস্টাইনের দুনিয়ার সবচেয়ে ভাল বোঝা আমাদের সময়ের নায়ক স্টিফেন হকিং।

একবার নিউইয়র্কে জাহাজ নেওড় করার পর সাংবাদিকরা আইনস্টাইনকে বললেন, আপনার আপেক্ষিকতত্ত্ব সহজ ভাষায় আমাদের বুঝিয়ে দিন। আইনস্টাইন বললেন—‘আমার কথা যদি আপনারা আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ না করেন তবে এইভাবে বলতে পারি। আপেক্ষিক তত্ত্বের আগে আমাদের ধারণা ছিল সমগ্র বিশ্ব থেকে বস্তু অদৃশ্য হয়ে গেলেও দেশ আর কাল থাকবে। আপেক্ষিক তত্ত্ব বলে যে, বস্তুর সাথে সাথে দেশ ও কালও অদৃশ্য হয়ে যাবে।’

অন্য এক জায়গায় আপেক্ষিক তত্ত্বকে অতি সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আইনস্টাইন কিছুটা মজা করে বলেছিলেন—‘কোনো পুরুষ একজন সুন্দরীর সাথে এক ঘন্টাকাল বসে থাকলেও সেই সময়টুকু তার কাছে মিনিট খানিকের চেয়ে বেশি মনে হবে না। কিন্তু সেই লোককেই একটি বিরাটাকৃতির তপ্ত কড়াই—এর ওপর যদি এক মিনিট বসিয়ে রাখা হয়, তবে তার কাছে সেই সময়টুকু মন হবে এক ঘন্টার চেয়েও বেশি। আসলে একেই বলে আপেক্ষিকতা।’

পদার্থবিজ্ঞানের ইতিহাসে সবচেয়ে আশ্চর্য ও দুঃখজনক ঘটনা হল, ১৯০৫ সালে আইনস্টাইন যখন Ph.D. ডিগ্রি লাভের জন্য তাঁর স্পেশাল থিউরি অব রিলেটিভিটি থিসিস আকারে বার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিল করেন, তখন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তা প্রত্যাখ্যান করেন। তার আপেক্ষিকতা অনেক প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানী হানতে রাজি হননি, কিন্তু আইনস্টাইনের গাণিতিক যুক্তির সামনে দাঁড়াতেও পারেননি। কথিত আছে, আইনস্টাইন যখন তাঁর নতুন তত্ত্ব সর্বসমক্ষে তুলে ধরার জন্য বিভিন্ন সেমিনারে ব্যাখ্যা দিয়ে বেড়াতেন, তখন অধিকাংশ শ্রোতা তা বুঝতে না পেরে হাসা-হাসি করত। এমন এক পরিস্থিতিতে তিনি একবার বিরক্ত হয়ে দৃঢ়তার সাথে বলেছিলেন, আজ আপনারা হাসছেন, কিন্তু আমার তত্ত্বের যথার্থতা প্রমাণিত হলে সুইজারল্যান্ডবাসীরা বলবে আমি সুইস, আর জার্মানিরা বলবে আমি জার্মান। তার মন্তব্য যে যথার্থ ছিল তা আজ আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

নোবেল কমিটি পদার্থবিজ্ঞানে মৌলিক অবদানের জন্য আইনস্টাইনের নাম ১৯১১ এবং ১৯১৫ এই দু বছর ছাড়া ১৯১০ থেকে ১৯২২ সালের মধ্যে প্রতি বছরই তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেওয়ার জন্য নাম প্রস্তাব করা হয়েছে। অথচ তিনি ১৯২২ সালের নোবেল কমিটি কর্তৃক ১৯২১ সালের জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন।

১৯৫৫ সালে এই জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানীর মৃত্যুর পর ইউরোপের পত্রিকায় একটি ছবি ছাপা হয়—অনেক গ্রহ নক্ষত্র ছুটে চলছে তার একটির গায়ে লেখা আছে এখানে আইনস্টাইন বাস করত। একথা বুঝতে বোধ হয় কারো অসুবিধা হয়নি: এ পৃথিবী নামক গ্রহের পরিচয় আইনস্টাইনকে দিয়ে।

এই মহান বিজ্ঞানী আইনস্টাইনকে দুর্জয়তার অপবাদ দেওয়া হলেও বিশ্বকে জটিল তত্ত্বের জালে জড়িয়ে দুর্জয় রহস্যময় করে তোলা মোটেই তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো না। তিনি বরং চেয়েছিলেন প্রকৃতিই যে দুর্জয়, রহস্যময়, তাকে কতগুলো সহজ তত্ত্ব আর সূত্রের মাধ্যমে মানুষের কাছে স্বচ্ছ আর স্পষ্ট করে তুলতে।

আলবার্ট আইনস্টাইন কোনো দেশের বা কারো একার সম্পদ নয়, তিনি সমগ্র পৃথিবীর অনন্য সম্পদ। আইনস্টাইন একজন বড় বিজ্ঞানী আর সৃষ্টিশীল উদ্ভাবক হিসেবে যেমন বড় তেমনি বড় মানুষ হিসেবে। সমগ্র মানব জাতির কল্যাণে নিবেদিত একজন সমাজ সচেতন দার্শনিক ও কর্মী হিসেবে। তিনি শুধু শান্তিবাদী নন তিনি ছিলেন শান্তির সৈনিক। মানবতার জন্য গভীর ভালবাসা, মানুষের জীবনের প্রতি অসম্ভব মমত্ববোধ ছিল তাঁর। আজ এই আন্তর্জাতিক পদার্থবিজ্ঞানবর্ষ পালনের এই দুনিয়াজোড়া আয়োজনে আজকে সব বিজ্ঞানী, সব মানুষ যদি তার কাছে থেকে শিক্ষা নিতে পারে বিজ্ঞানের অক্লান্ত সাধনার, মানুষের শান্তিময় ভবিষ্যতের সংগ্রামে তার সহযাত্রী হবার তাহলে হবে তার প্রতি সবচেয়ে বড় শ্রদ্ধা জানানো।

জহুরুল হক বুলবুল  
বিভাগীয় প্রধান  
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ  
কালিহাতী কলেজ, টাঙ্গাইল



## জীন প্রকৌশল ও সুপারম্যান

জীন প্রকৌশল আর ক্লোনিং এর যুগে ভবিষ্যতের মানুষ কেমন হবে তা নিয়ে জল্পনা কল্পনার অভাব নেই। কেমন হবে সেই অনাগত মানুষেরা তা নিয়ে একটু কল্পনা করা যাক।

নাইটভিশন ম্যান : এক্ষেত্রে বাঘ, সিংহ, বিড়াল ইত্যাদি প্রাণী যে জীনের প্রভাব জীং অঙ্গো বা রাতের আঁধারে দেখতে পায় সেই জীন প্রতিস্থাপিত করে মানুষ হবে নাইটভিশন চমক মত নাইটভিশন ম্যান।

ভবিষ্যতের পরী : অতীত রূপকথায় দেখা যায় পরীদের ডানা আছে ফলে তারা উড়ে পড়ে ভবিষ্যতে জীন প্রকৌশলের মাধ্যমে অ্যালবট্রিস পাখীর মত ডানা গজিয়ে নিয়ে ঈগলের মত উচ্চ নাইটভিশন মানুষ হয়ে উঠবে সত্যিকারের পরী।

সাগরকন্যা : জলপরী বা মৎস্য কন্যাও হয়ে যেতে পারে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। হালকা মত সামুদ্রিক অথচ পোষ্য মানে, মানুষের কথা শোনে এমন কোন সামুদ্রিক জীবের জীন ব্যবহার করে।

মেরুচর-মরুচর : মেরুসম্রাট শ্বেতভল্লুক বা এক্সিমোদের প্রিয় সিল, এন্ট্রোপিক বস্তুপঙ্খুইন এবং মরুভূমির জাহাজ উটের জীন প্রতিস্থাপন করে মানুষ একই সাথে হয়ে উঠতে পারে মেরুচর-মরুচর। এভাবে স্থলচর মানুষ হয়ে উঠতে পারে বিস্ময় প্রাণী।

আধুনিক জাদুকর : রূপকথার জাদুকর মন্ত্র পড়ে বা প্রদীপ ঘষে ভূত-প্রেত বা জীন হাফির করে ইচ্ছেমত কাজ করিয়ে নিত। সুপার কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত রোবটের উন্নয়ন যেভাবে হচ্ছে তাতে মানুষ মনের কথা বুঝে নিয়ে রোবটগুলি দুঃসাহ্য কাজ এক নিমেষেই করে দিবে। আর মানুষ হয়ে উঠবে অধুনিক জাদুকর।

অতিমানব : সুপার কম্পিউটারের চেয়ে মনুষ্য মস্তিষ্কের কার্যকারিতা সন্তান নির একই বেশি কোটি গুণ বেশি। এমন দিন আসবে যেদিন মানুষের ভুল ভেঙ্গে যাবে সেদিন মানুষ সুপার কম্পিউটারের মতও উন্নততর করার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত না হয়ে এমন কোন পদ্ধতি আবিষ্কার করবে যার ফলে মানুষ তার সমস্ত সম্পূর্ণ মস্তিষ্ক কোষ ব্যবহার করে হয়ে যাবে অতিমানব। কারণ মস্তিষ্কের অতি সামান্য অংশ ব্যবহার করে মানুষ যদি চাঁদে যেতে পারে, সুপার কম্পিউটার আবিষ্কার করতে পারে, ক্রোন করে ডলির জন্য নিজে পান হয়ে সম্পূর্ণ মস্তিষ্ক কোষ ব্যবহার করতে পারলে কতখানি অতিমানব হতে পারে তা কল্পনা করা বাস্তব মত।

খাদ্য উৎপাদক : এ জগতে একমাত্র খাদ্য উৎপাদক উদ্ভিদ আর সন্তান জীব হনর। ক্লোরফিল উৎপাদনকারী জীন মানব দেহে প্রতিস্থাপন করলে মানুষ হবে আপাত স্বনির্ভর হন উৎপাদক।

দ্বৈত সত্তা : যখন মানুষের বিভিন্ন অঙ্গ যেমন-কর্নিয়া, কিডনি, অস্থিমজ্জা, হৃৎপিণ্ড ইত্যাদির মত মস্তিষ্ক ও প্রতিস্থাপন করা যাবে তখন কী হবে? যার মস্তিষ্ক তার স্মৃতি থাকবে। অর্থাৎ তার চিন্তা, প্রিয় পরিবার, পরিজন, বন্ধু ইত্যাদি মনে থাকবে। অপর দিকে যার দেহ জননাস্রের কারণে পরবর্তী প্রজন্ম হবে তার। স্মৃতির কারণে মস্তিষ্ক যার সে বুঝতে পারবে দেহ তার নয়। সুতরাং পরবর্তী প্রজন্মও তার নয়। তবে নতুন প্রজন্মও জন্ম দেয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। তখন আসলে কে বেঁচে থাকবে? মস্তিষ্কধারী নাকি দেহধারী? কী হবে সেই দ্বৈত সত্তার?

অমরভুজয়ী : সব শেষে যা বলব তাতে অনেকের কাছে আমাকে নাস্তিক বলে মনে হতে পারে। এখন মানুষ হৃৎপিণ্ডের মত সংবেদনশীল অঙ্গে কৃত্রিম পেসমেকার ব্যবহার করছে। নানারকম হস্ত-পুষ্টি, তন্ত্র ইত্যাদি নির্মিত বস্তু মানবদেহে প্রতিস্থাপনের হার প্রতিনিয়তই বাড়ছে। কোমায় চলে যাওয়া মানুষকে যন্ত্রিক সহায়তায় বাঁচিয়ে রাখা হচ্ছে। আবার টিস্যুকালচারের মাধ্যমে কৃত্রিম অঙ্গ তৈরি করে প্রতিস্থাপনের চেষ্টাও চলছে যা অদূর ভবিষ্যতেই সফল হবে বলে আশা করা যায়। এমন সময় কী আসতে পারে না যখন যে জীনের কারণে শিশুর ক্রমবিকাশে নতুন কোষ, কলা, তন্ত্র, অঙ্গ ইত্যাদি বৃদ্ধি ও পূর্ণতা পায় সেই জীনের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করে বা



জীনটি বার বার ব্যবহার করে ক্ষতিগ্রস্ত কোষ, কলা , তন্ত্র, অঙ্গ ইত্যাদি নতুন করে গঠন করা যাবে । ফলে তখন ঔষধ, অপারেশন ইত্যাদি প্রয়োজনই হবে না । আর সেক্ষেত্রে কী প্রতিদিনই একটি মানুষ বিশোধিত নবমানবে পরিণত হয়ে অমরত্বের দিকে এগিয়ে যাবে না ?

আমার এই কল্পনা হয়তো সত্যি হবে কিংবা হবে না । সেটা যাচাই করার জন্য আমরা সম্ভবত কেউই ততদিন এই পৃথিবীতে থাকব না ।

মাহবুবা ফারহানা নাজনীন লুৎফে

প্রযত্নে-ফজলে করিম মুকুল (উকিল)

নবাবগঞ্জ ঘোষপাড়া, হোল্ডিং-০৮

ওয়ার্ড নং-৪, রাজশাহী কোর্ট, রাজপাড়া, রাজশাহী